নাথুরামের কবলে মনিরা—৪

নথুরামের কবলে মনিরা

আজ ক'দিন হয় মনিরা এই অন্ধকার কক্ষে বন্দী হয়ে রয়েছে। এ ক'দিনের মধ্যে দু'দিন মাত্র খেয়েছে সে। আর বাকি দিনগুলো পানি ছাড়া কিছু মুখে দেয়নি। চোখ বসে গেছে। চুল এলোমেলো বিক্ষিপ্ত। ক'দিন গোসলেরও নাম করেনি সে। অবশ্য তাকে এসবের জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

মনিরাকে এই অন্ধকার কক্ষে বন্দী করে রাখার পর প্রায়ই আসতো নাথুরাম আর তার সঙ্গী জগাই। জগাইও নাথুরামের চেয়ে কুৎসিত কম নয়। হৃদয়টাও তেমনি জঘন্য শয়তানিতে ভরা। কঠিন পাথরের মত মন। যেমন নাথুরাম তেমনি তার সঙ্গী।

এদের দেখলেই মনিরা মুখ ফিরিয়ে নিতো। ঘৃণায় কুঞ্চিত হত তার নাসিকা। ওরা কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে মনিরা জবাব দিতো না। খাবার নিয়ে এলে খেত না সে। নাথুরাম কুৎসিত ইংগিতপূর্ণ তামাশা করতে ছাড়ত না। মনিরা নিশ্চুপে শুনে যেত, কারণ সে জানে কোন কথা বলে লাভ হবে না। বরং এতে তার বিপদ আরও বাড়বে। তাই নীরবে সহ্য করে যেতো। কিন্তু এ ক'দিনের মধ্যে মনিরার চোখের পানি একটিবার শুকিয়েছে কিনা সন্দেহ।

নাথুরাম কুৎসিত ইংগিতপূর্ণ হাসি-তামাশা করা ছাড়া মনিরার সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করতে সাহসী হত না, কারণ তারা জানতো মনিরা মুরাদের ভাবী বধূ।

মনিরাকে মুরাদের হাতে পৌঁছানোর জন্য মোটা বখশিস পেয়েছে তারা, ভবিষ্যতে আরও পাবে। নাথুরাম তার সঙ্গী জগাইকে নিষেধ করে দিয়েছে কেউ যেন মনিরার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করে।

মনিরা দাঁতে দাঁত পিষতো। কিন্তু কি উপায় আছে। সে দুর্বল অসহায় নারী।

মনিরা যখন বেশ ক'দিন না খেয়ে কাটিয়ে দিল তখন এক বুড়ীকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো নাথু। মনিরাকে সর্বক্ষণ দেখা-শোনা আর নাওয়া-খাওয়া করানোর ভার দিল তার উপর। খুব সাবধানে কড়া পাহারায় রাখার নির্দেশ দিল নাথুরাম।

মনিরা তবু মনে কিছুটা সাহস পেল। যা হউক বৃদ্ধা হলেও সে নারী। নাথুরাম আর জগাইয়ের হাত থেকে আপাতত রক্ষা পেল সে তাহলে।

নাথুরাম আর জগাই বারবার বৃদ্ধাকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় একটা চাবি বুড়ীর হাতে দিয়ে বলল নাথুরাম–সতী, এই নাও চাবি, তুমি যখনই বাইরে যাবে, দরজায় তালা মেরে যাবে, দেখ মেয়েটা যেন না পালায়।

বৃদ্ধা জবাব দিল–কি যে বলো! আমার নাম সতী, আমার নিকট থেকে মেয়ে পালাবে, অমন জীবন রাখব না।

নাথুরাম হেসে বেরিয়ে গেল, জগাই তাকে অনুসরণ করলো।

এতক্ষণে মনিরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো বৃদ্ধার দিকে। ঠিক বৃদ্ধা নয় বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দাঁতও পড়েছে অনেকগুলো। দু'চারটে যা আছে তাও নড়ছে। কথা বলার সময় বেশ বুঝা গেল সেটা।

বৃদ্ধার চুল পাকলে কি হবে। দাঁত নড়লেও কিছু আসে যায় না, তার সাজ-সজ্জা ছিল খুব। বিনুনী করে খোঁপা বাঁধা, কপালে সিঁদুরের টিপ, গালে কুমকুম, ঠোঁটে পানের রঙের সঙ্গে লাল

রং মেশানো রয়েছে। বৃদ্ধার গায়ের রং তামাটে। নাকটা বোঁচা, কেমন যেন বিদঘুটে চেহারা ওকে দেখে মনিরার গা রি রি করে উঠল। যা চেহারা তার নাম আবার সতী। তবু এই নির্জন সঙ্গীহীন কক্ষে ওকেই মনিরা সাথী করে নিল।

মনিরাকে সতী তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে বললো—কিগো, অমন করে তাকিয়ে দেখছো কি দেখছ?

মনিরা নিশ্চুপ থাকা ঠিক মনে করলো না, সেও বেশ স্বচ্ছকণ্ঠে বলল-একটু পানি দেবে আমাকে?

বুড়ি হেসে বলল-পানি খাবে তাই আবার এত কথা। দাঁড়াও এনে দিচ্ছি।

বুড়ি লন্ঠন হাতে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাবার সময় দরজার তালা লাগাতে ভুলল না সে।

মনিরা বুঝল বুড়ি খুব চালাক। একটু পর এক গেলাস পানি হাতে কক্ষে প্রবেশ করলো সতী। বাঁ হাতে লন্ঠন, দক্ষিণ হাতে পানির গেলাস।

মনিরা ভাবলো-বুড়ীকে কাবু করে পালানো খুব সহজ, কিন্তু কক্ষের বাইরে বলিষ্ঠ দু'জন পাহারাদার বন্দুক হাতে সতর্কভাবে পাহারা দিচ্ছে, তাদের চোখে ধুলা দিয়ে পালানো সম্ভব হবে না। তাছাড়া কক্ষটা কোথায়, শহরে না গহন বনে, মাটির নিচে না উপরে-তাও জানে না সে।

বুড়ীর হাত থেকে পানির গেলাসটা নিয়ে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে বলে মনিরা-আচ্ছা, তোমাকে আমি কি বলে ডাকবো?

সতী দিদি বলে ডেকো-এ নামেই সবাই আমাকে ডাকে।

এরপর থেকে সতী বুড়ীই মনিরার খোঁজখবর নিতো। খাবার সময় হলে খাবার নিয়ে আসতো। মাঝে মাঝে চুল আঁচড়ে বেঁধে দিতো। কিন্তু বুড়ী যাওয়ার সময় লণ্ঠনটা নিয়ে যেত। তখন মনিরা অন্ধকারে প্রহর গুণতো। কক্ষে অন্য কোন আলোর ব্যবস্থা না থাকায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো সে। অসুবিধা হত অনেক। তবু নীরবে প্রতীক্ষা করতো সতীর। দরজার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো। এমনিভাবে আর কতদিন কাটবে!

একদিন বুড়ীর হাত পা ধরে কেঁদেছিল মনিরা, তাকে একটু বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছিল সে। কিন্তু বুড়ী বড় শক্ত। পাষাণ তার হৃদয়। হেসে বলেছিল—সাহেব ভাল হলে কত বাইরে যাবে, যেও। কত হাওয়া খাবে, খেও। তুমিই তো তাকে জখম করেছ।

মনিরা তবু শেষ চেষ্টা করে বলেছিল, তোমাকে অনেক টাকা দেব সতী দিদি।

বুড়ী জবাব দিয়েছিল—আমার তো টাকার কোন অভাব নেই। সাহেব আমাকে হাজার হাজার টাকা দিয়েছে। শুধু তুমি কেন, তোমার মত কত যুবতীকে আমি বাগে রেখেছি। তারা এখন সবাই আমার হাতের মুঠোয়। শিউরে উঠেছিল মনিরা, কিছুক্ষণ স্তব্ধ চোখে লণ্ঠনের আলোতে তাকিয়ে তাকিয়ে বুড়ীকে দেখেছিল। ভাবছিল, এর হাত থেকে বুঝি আর রক্ষা নেই।

বুড়ি যাবার সময় আলো নিয়ে চলে যায় কেন, একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল মনিরা তাকে। বুড়ি হেসে বলেছিল—আমি বোকা মেয়ে নই। তোমার মত অমন কত যুবতীকে আমি বশে রেখেছি। কারও ঘরে লণ্ঠন রাখিনি।

কেন রাখনি

কেন রাখিনি জান? তোমরা যদি শাড়িতে আগুন ধরিয়ে পুড়ে মর।

বুড়ীর বুদ্ধির জোর দেখে মনিরা এত দুঃখেও হেসেছিলো। তার নিজের এতটুকু বুদ্ধিও নেই, তাহলে সেদিন সে নিজ হাতে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতো না। হায়, কি সর্বনাশ সেদিন মনিরা করে বসেছে। এতদিনে হয়তো মনির ফিরে এসেছে। হয়তো তার সন্ধান নিতে এসে নিরাশ হৃদয় নিয়ে ফিরে গেছে। তার মামুজান আর মামীমার অবস্থা যে কি দাঁড়িয়েছে কে জানে। হয়তো পুলিশ

মহল তার সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখন সে কোথায় রয়েছে নিজেই জানে না। যে ঘরে সে বন্দী সে ঘর খানা কোথায়–মাটির বুকে না মাটির নিচে? আজ বুড়ী এলে যেমন করে হোক এ কথা জেনে নেবে মনিরা। অসহ্য অন্ধকার–মনিরা হাঁপিয়ে উঠেছে। আলো, আলো একটু আলো তার প্রয়োজন।

মনিরার চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন করে অন্ধকারে আলোকরশ্মি ভেসে এলো। কখন যে দরজা খুলে লণ্ঠন হাতে বুড়ী এসে দাঁড়িয়েছে, খেয়াল করেনি সে।

মনিরা বুড়ীকে দেখে উঠে দাঁড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার মত চমকে উঠলো সে–বুড়ীর পেছনে যমদূতের মত দাঁড়িয়ে আছে মুরাদ। গায়ে জামার পরিবর্তে একটি চাদর জড়ানো।

মনিরাকে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়াতে দেখে বলল মুরাদ–ভয় নেই, ভূত নই মনিরা। তোমার ছোরার আঘাতে আমার মৃত্যু ঘটেনি।

দাঁতে দাঁত পিষে বলে মনিরা–তা আমি জানি।

জান! আমার মৃত্যু ঘটেনি, জেনে খুশি হয়েছিলে প্রিয়ে?

মনিরা কোন জবাব দিল না।

মুরাদ বুড়ীকে বেরিয়ে যেতে ইংগিত করলো।

বুড়ী মেঝের একপাশে লণ্ঠন নামিয়ে রেখে বেরিয়ে যায়।

মনিরা প্রমাদ গণে। এতক্ষণ তবু কতকটা সে আশ্বস্ত ছিল, বুড়ী বেরিয়ে যেতেই কণ্ঠতালু তার শুকিয়ে ওঠে। বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয় মুখমণ্ডল। হিংস্র জন্তুর কবলে যেমন মেষশাবকের অবস্থা হয়, তেমনি অবস্থা হয় মনিরার। এই নির্জন কক্ষে আজ তাকে রক্ষা করার মত কেউ নেই। মনিরা অসহায়ের মত পিছু হটতে লাগল।

মুরাদের মুখে কুৎসিত হাসি ফুটে উঠেছে, দু'চোখে লালসাপূর্ণ চাহনি। গম্ভীর কণ্ঠে বলল–মনিরা, তুমি যে আঘাত আমাকে দিয়েছ, তা আমি নীরবে সহ্য করেছি, অন্য কোন নারী হলে আমি তাকে হত্যা করতাম।

মনিরা তীব্রকণ্ঠে বলল–তাই কর, তুমি আমাকে হত্যা কর শয়তান। এ বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো।

মুরাদ অদ্ভুত একটা শব্দ করলো–তাই নাকি? কিন্তু তোমাকে হত্যা করে আমি বাঁচবো কেমন করে! এসো লক্ষ্মীটি আমার। মনিরা, জান তোমাকে আমি কত ভালবাসি! আমার গোটা হৃদয় জুড়ে তুমি আর তুমি। তোমাকে পাবার দুর্বিসহ জ্বালা আমার গোটা অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার শরীরে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছ তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষত হয়েছে আমার মনে। তোমাকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব।

মনিরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছে মুরাদের কথাগুলো। বারবার জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দু'খানা চেটে নিচ্ছিল। চোখের দৃষ্টি অসহায়ের মত ছুটে যাচ্ছিলো দরজার দিকে। এই মুহূর্তে কেউ কি তাকে বাঁচাতে পারে না। বুড়ীটা এলেও একটু সাহস হত তার। মনে-প্রাণে খোদাকে স্মরণ করে মনিরা।

লণ্ঠনের আবছা আলোতে মুরাদকে একটা ভয়ঙ্কর জীব বলে মনে হয় মনিরার। ক'দিনের অনাহারে শরীর দুর্বল। কণ্ঠতালু শুকিয়ে আসছে। চোখদুটিও বারবার ঝাপসা হয়ে আসছে। বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। এবার আর তার রক্ষা নেই। পাপিষ্ঠ মুরাদ আজ তাকে পাকড়াও করবেই। কিন্তু তা কিছুতেই হতে পারে না। যেমন করে হোক নিজকে ওর কবল থেকে বাঁচাতেই হবে। মনিরা মনে মনে এক বুদ্ধি আঁটলো হঠাৎ দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে বলে উঠলো–উঃ একি হল! চোখে এমন অন্ধকার দেখছি কেন, মা–মাগো–মনিরার দেহটা টলছে।

মুরাদ হঠাৎ ভড়কে যায়। অধীর কণ্ঠে বলে ওঠে—কি হল মনিরা, কি হল তোমার? যেই মুরাদ ওকে ধরতে যাবে অমনি মেঝেতে পড়ে গেল মনিরা।

মুরাদ তাড়াতাড়ি ওর মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাকল–সতী–সতী–

সতী বুড়ী হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করলো—আমায় ডাকছেন বাবু?

হ্যাঁ, দেখো সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। শিগগির পানি নিয়ে এসো।

বুড়ী সতী দেবী ছুটলো পানি আনতে।

মনিরা তবু নিশ্চিন্ত নয়। মুরাদের কোলে মাথা রেখে মনটা তার ভয়ে শিউরে উঠছে, তবু নীরবে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল।

সতী অল্পক্ষণের মধ্যেই এক ঘটি পানি নিয়ে হাজির হল–এই নিন পানি।

মুরাদ পানি নিয়ে মনিরার চোখেমুখে ঝাপটা দিতে শুরু করল আর বার বার ডাকতে লাগলো–মনিরা, মনিরা.....

মনিরা কিন্তু কিছুতেই চোখ মেললো না, যদিও পানির ঝাপটা তার অসহ্য লাগছিল তবু নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইল।

মুরাদ তখন মনিরার জ্ঞান ফিরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, ঠিক তক্ষুণি কারও অশ্বপদ শব্দ শোনা গেল। মুরাদ বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করলো–কে এলো সতী?

সতী জবাব দেবার পূর্বেই শোনা গেল একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর–হুজুর আমি।

ওঃ নাথুরাম, এতদিন কোথায় ডুব মেরেছিলে নাথু?

হুজুর, আমার অনেক কাজ। অনেক দিকে আমাকে সন্ধান রাখতে হয়। কিন্তু ওর কি হয়েছে হুজুর?

হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। নাথু, অনেকক্ষণ পানির ছিটা দিচ্ছি, তবু জ্ঞান ফিরছে না, কি করা যায় বলতো?

দেখি আমি। মনিরার পাশে বসে নাথুরাম।

মনিরার অন্তর কেঁপে ওঠে। আর কতক্ষণ নিজকে এভাবে বাঁচিয়ে রাখবে, পানির ঝাপটা খেয়ে খেয়ে ঠান্ডা ধরে এলো। নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করছে। চুল ভিজে চুপষে গেছে। কাপড়ের অবস্থাও তাই। তবে সে নিশ্চুপ পড়ে আছে।

নাথুরাম মনিরাকে পরীক্ষা করে বলল–কোন চিন্তা নেই হুজুর,জ্ঞান ফিরে আসবে।

মুরাদ আবার ডাকল–মনিরা–মনিরা, চোখ মেলে দেখ।

মনিরা চোখ মেলল না, যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইল।

নাথুরাম বলল–হুজুর, আমি বেশিক্ষণ বিলম্ব করতে পারছি না। আজ বেটা ঘুঘুটাকে ফাঁদ থেকে বের করে আমাদের জম্বুর বনের গুহায় নিয়ে যাব।

মুরাদ প্রশ্ন করল–কার কথা বলছ, ডিটেকটিভ শঙ্কর রাওয়ের কথা বলছো?

হ্যাঁ, তাকে আর এখানে–মানে এই শহরের বাড়িতে রাখা ঠিক নয়। লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত, কোনক্রমে যদি বেরুতে পারে, তাহলে আর আমাদের রক্ষা থাকবে না।

মনিরা নিশ্চুপ সবই শুনে যাচ্ছিলো। সে এখন তাহলে শহরের কোনো গোপন বাড়িতে বন্দী রয়েছে। মিঃ রাও তিনিও তাহলে বন্দী এবং এই বাড়িতেই কোন কক্ষে তাঁকে আটক করে রাখা হয়েছে। মনিরার মনে একটু সাহস হয়। সে তাহলে শহরের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু জম্বুর বন তা আবার কোথায়! মিঃ রাওকে তাহলে জম্বুর বনে নিয়ে যাওয়া হবে। মনিরার কানে আবার আসে মুরাদের কণ্ঠস্বর....নাথু, মনিরাকেও এখানে রাখা ঠিক হবে না, কারণ এখনও আমি সম্পূর্ণ

আরোগ্য হইনি, আমি ঠিকভাবে মনিরাকে দেখাশুনা করতে পারছি না। আরও কিছুদিন আমি মনিরাকে কোথাও গোপন করে রাখতে চাই।

সেজন্য কোন চিন্তা নেই হুজুর। নাথুরামের অসাধ্য কিছুই নেই। ওকে জম্বুর বনের পাতালপুরীর কক্ষে নিয়ে রাখব।

মুরাদের ব্যথাহত কণ্ঠস্বর–কিন্তু আমি?

সেজন্য ভাববেন না হুজুর। আপনার ঘা শুকিয়ে গেলে আপনিও যাবেন সেখানে, কোন অসুবিধাই হবে না আপনার। সুন্দর ঘর, পরিষ্কার বিছানাপত্র সব পাবেন আমার সেই পাতালপুরীর কক্ষে।

মুরাদ নাথুরামের কথায় খুশি হয়, আনন্দভরা গলায় বলে–সত্যি নাথুরাম তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব! যাবার সময় পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে যেও আমার কাছ থেকে।

মনিরার নাকে পানি প্রবেশ করায় বড্ড হাঁচি পাচ্ছিল, আর নিজকে সংযত রাখতে পারল না সে, হঠাৎ হচ্চো করে হেঁচে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে নাথুরাম আর মুরাদের কথা থেমে গেল। নাথুরাম বলল–হুজুর, এবার ওর জ্ঞান ফিরে আসবে, আর কোন চিন্তা নেই। তাহলে একে কবে সরাচ্ছি হুজুর?

মুরাদের চাপা কণ্ঠ—চুপ! জ্ঞান ফিরে এসেছে, সব জেনে ফেলবে।

হেসে বলল নাথুরাম–ভয় পাবার কিছু নেই হুজুর, নাথুরামের সেই পাতালপুরীর গোপন কক্ষ কেউ খুঁজে পাবে না একমাত্র যম ছাড়া।

মুরাদের হাসির শব্দ–ঠিক বলেছ। যেখানে মানুষ প্রবেশ করতে সক্ষম নয়, সেখানে যম কিন্তু অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে।

হঠাৎ বলে উঠল বুড়ী সতী দেবী–আপনারা যাই বলুন, দস্যু বনহুর কিন্তু যমের চেয়েও ভয়ঙ্কর। সাবধানের মার নেই।

মনিরা বুড়ীর মুখে বনহুরের নাম শুনে কেমন যেন মুগ্ধ হল। খুশি হল সে। ঠিকই বলেছে বুড়ী। বনহুরের নামে যে মধু মেশানো ছিল, সেই মধু মনিরাকে চাঙ্গা করে তোলে। ভাবে সে ভয় কি, তার মনির রয়েছে। নিশ্চয়ই সে চুপ করে বসে নেই। যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বের করবেই। খোদার ওপর অগাধ বিশ্বাস মনিরার , তাই ইজ্জত রক্ষা করবেনই তিনি।

মনিরা নিশ্চুপ পড়ে থেকেও বুঝতে পারল, নাথুরামের কানে কি যেন গোপনে বলল মুরাদ। নাথুরাম উঠে দাঁড়াল, তারপর বেরিয়ে গেল।

মুরাদ এবার সতীকে লক্ষ্য করে বলল–এর ভিজে কাপড় পাল্টে দাও। বেশ করে চুলগুলো আঁচড়ে দেবে। ভালমত জ্ঞান ফিরলে খাবার এনে দিও, বুঝেছ?

আপনার অত বুঝাতে হবে না বাবু, আমি সব ঠিক করে নেব।

মুরাদ মনিরার মাথা কোল থেকে নামিয়ে রাখল, তারপর পিঠের আর হাঁটুর নিচে হাতে দিয়ে তুলে পাশের খাটে শুইয়ে দিল। মনিরা স্তব্ধ নিঃশ্বাসে চুপ করে রইল।

মুরাদ ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আর একবার বুড়ীকে তার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো মনিরা। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিল। যাক উপস্থিত বিপদ থেকে তবু রক্ষা পেল। কিন্তু এর চেয়ে আরও কঠিন বিপদ এগিয়ে আসছে তার জন্য। এত সহজেই তার নেতিয়ে পড়াও ঠিক হবে না–আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে বাঁচতে।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল মনিরা, একটু পানি দাও।

বুড়ী তাড়াতাড়ি পাশের একটি কলস থেকে গেলাসে পানি ঢেলে মনিরার মুখে তুলে ধরে

মনিরা আস্তে আস্তে উঠে বসল, তারপর এক নিঃশ্বাসে পানিটুকু খেয়ে খালি গেলাসটা ফিরিয়ে দিল বুড়ীর হাতে।

বুড়ী সতী হেসে বলল—এইতো ভালো হয়ে গেছ। এতক্ষণ বেচারা মুরাদ সাহেব কত কি করলেন। এখন ভালো বোধ করছ তো?

হাঁ, কিন্তু মাথাটা বোঁ বোঁ করছে, চোখে অন্ধকার দেখছি।

আজ ক'দিনের মধ্যে মুখে কিছু দিয়েছ, অমন হবে না? দাঁড়াও তোমার জন্য খাবার আনতে বলি।

বেশ, বল।

বুড়ী দরজার কাছে গিয়ে শিস দিল। সেকি কাণ্ড, মনিরা অবাক হলো। বুড়ীর দাঁত নেই তবু শিস দেবার ঢং দেখে রাগও হল, হাসিও পেল তার।

অমনি একজন দারোয়ান গোছের লোক এসে বুড়ীকে সালাম করে দাঁড়ালো। বুড়ী বললো–এই, শিগগির কিছু খাবার নিয়ে এসো, মেম সাহেব খাবেন।

লোকটা বুড়ীর কাঁধের উপর দিয়ে একবার মনিরার দিকে তাকিয়ে চলে গেল।

বুড়ী এসে বসল মনিরার পাশে।

মনিরা বলল–সতী দিদি, তুমি এদের ঝি, তাই না?

ছিঃ ছিঃ কি যে বল, আমি—আমি হলাম কিনা-ঐ তো সেদিন বলেছি তোমাকে।

হাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম, তুমি এদের সতী দিদি। আচ্ছা লক্ষ্মী দিদি, এই বনটা শহর ছেড়ে কতদূর?

হেসে উঠলো বুড়ী সতী দেবী, বলল–কে বলে এটা বন? এটা বাড়ি, চোখে দেখতে পাওনা?

বাড়ি তো দেখছি, কিন্তু কোথায়–শহরে না বনে?

শহরে গো শহরে। কিন্তু মুরাদ সাহেব তোমাকে আজ অন্য জায়গায় চালান করবে।

কেন?

সে সব আমি কি জানি?

সতী দিদি, বল না কোথায় চালান করবে?

বললাম তো আমি জানি না।

এমন সময় দরজা খুলে যায়, সেই দারোয়ান গোছের লোকটা থালায় খাবার নিয়ে হাজির হয়। খাবার রেখে চলে যায় সে।

মনিরা কাপড়খানা পাল্টে কিছু খাবার মুখে তুলে দেয়। অনেক দিন পর আজ ভাল করে চুল বাঁধে সে। বুড়ী আজ খুব খুশি। মনিরা চুল বাঁধতে বাঁধতে বলে–আচ্ছা সতী দিদি, ওকে কেমন করে চিনলে?

কাকে লো?

ঐ যে তাকে?

তোমার সেই দস্যুটা?

হ্যাঁ।

ও বাবা, তাকে চিনব না, এ শহরের কে না চেনে তাকে?

তুমি তাকে দেখেছ কোনোদিন?

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে সতী–ও কথা বল না। দস্যু বনহুরকে দেখতে চাই না বাবা!

কেন?

সে নাকি যমের মত দেখতে।

খুব ভয়ঙ্কর, না?

তা তুমিই ভালো জানে, সে তোমাকে ভালবাসে।

কে বলল এ কথা তোমাকে সতী দিদি?

নাথু বলেছে।

কি বলেছে সতী দিদি, বল না?

ও! ঐসব আবার শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি?

খুব!

বলেছিল সে, দস্যু তোমাকে নাকি পিয়ার করে, ভাল বাসে, আমি যেন তোমার ওপর খুব কড়া নজর রাখি। আচ্ছা মেয়ে, তোমার কি আর কাজ ছিল না, একটা কুৎসিত লোককে ভালবাসতে গিয়েছিলে?

কে বলল আমি তাকে ভালবাসি?

জানি, সব বলেছে নাথু আমাকে। তুমি দস্যু বনহুরকে অনেক ভালবাস। আচ্ছা, আমাদের মুরাদ সাহেবকে ভালবাসতে পার না।

আনমনা হয়ে যায় মনিরা। বনহুরের সুন্দর মুখখানা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে তার চোখের সামনে।

বুড়ী হেসে বলে—ওকে মনে পড়েছে বুঝি? ছিঃ দেখতে অমন বিদঘুটে লোককে আবার মনে পড়ে? ওর চেয়ে মুরাদ সাহেব কত সুন্দর-যেন যুবরাজ। ওগো, তোমার সেই কুৎসিত লোকটা কেমন দেখতে?

আমার বনহুর?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

তোমার নাথুর চেয়ে খারাপ দেখতে।

গালে হাত দেয় বুড়ী—সে কি গো, এমন তোমার চেহারা আর তুমি কিনা... ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তার চেয়ে মুরাদ সাহেবকে স্বামী করে নাও, কোন বালাই থাকবে না।

তাই করে নেব সতী দিদি, তাই করে নেব।

সত্যি!

হ্যাঁ। কিন্তু আমি যা বলব তাই করবে? কতদিন একটু আলো-বাতাসের মুখ দেখি না। তুমি আমাকে বাইরে নিয়ে যাবে?

বাইরে! সর্বনাশ, ঐ কাজটা আমার দ্বারা হবে না। বুঝেছি পালাবে তুমি!

ছিঃ ছিঃ ছিঃ, পালাব আমি-কখ্ খনও না। তোমাদের মুরাদ সাহেবের মত সুন্দর-সুপুরুষ লোক থাকতে আমি যাব বনহুরের মত একটি কুৎসিত লোকের কাছে ? আরে থু! সত্যি দিদি, তুমি কত সুন্দর।

নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে গর্বের হাসি হাসে বুড়ী, বলে— বয়সকালে যা রূপ ছিল, কী বলব তোমাকে।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। না হলে কি আর নাথুরামের মত মানুষ তোমাকে নিয়ে ভুলেছে?

তা সত্যি, ওর জন্যই তো স্বামীর ঘর ছেড়েছি। জোয়ানকালে ওর কি কম রূপ ছিল!

তা দেখতেই পাচ্ছি। সুপুরুষ বটে—সত্যি দিদি, তোমার চোখের তারিফ না করে পারি না। কিন্তু দিদি, তুমি আমাকে একটু বাইরে নিয়ে চল না।

মনিরার কথা শেষ হয় না, কক্ষে প্রবেশ করে নাথুরাম আর অন্য এক লোক। নাথু দাঁত বের করে কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠে-তা আর হচ্ছে না সুন্দরী, বাইরের আলো বাতাস দেখার ভাগ্য হবে

সেদিন তুমি মুরাদ সাহেবের গলায় মালা দেবে।

মনিরার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হয়ে ওঠে। তবু গলায় জোর দিয়ে বলে-শয়তান! জেনেও তু বাঁচবে। কিন্তু মনে রেখ, তুমিও মরবে।

অট্টহাসি হেসে ওঠে নাথুরাম—আমাকে সতী পাওনি যে, ভয় দেখিয়ে কাবু করবে। এমন কোন বীরপুরুষ নেই যে আমাকে মারতে পারে। তোমার বনহুরকে আমি পুতুল নাচ নাচাতে পারি জান সুন্দরী?

মনিরা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নাথুরাম তার পূর্বেই সঙ্গীটিকে ইংগিত করলো।

সতী অবশ্য মনিরার ওপর কিছুটা সদয় হয়ে এসেছিল, হয়তো বাইরে যাবার সুযোগ পেত সে ওর সহায়তায়, কিন্তু সব নস্যাৎ হয়ে গেল। পালাবার একটা ক্ষীণ আশা এতক্ষণ যা মনিরার মনের কোণে উঁকি দিচ্ছিল, সমূলে তা মুছে গেল। পাথরের মূর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে রইলো মনিরা।

নাথুর ইংগিতে তার সঙ্গীটা ভয়ঙ্কর চোখদুটি মেলে একবার মনিরার দিকে তাকাল, তারপর কোমরের ভেতর হতে একটা ময়লা রুমাল বের করে এগিয়ে গেল মনিরার পাশে।

ভয়ে মনিরার হৃদকম্প শুরু হলো, শিউরে উঠলো সে। নিশ্চয়ই ঐ ময়লা রুমালখানায় ঔষধ মাখানো রয়েছে। এখান থেকে তাকে সরানোর পূর্বে অজ্ঞান করা হবে, বুঝতে পারে মনিরা। কিন্তু কি উপায় আছে-বাঁচার কোনো পথ নেই। সে নারী-দুর্বল, অসহায়। লোকটার সঙ্গে পেরে ওঠা তার পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া নাথুরামের ভয়ঙ্কর কঠিন বলিষ্ঠ বাহু দুটির দিকে তাকিয়ে মনিরা স্তব্ধ হয়ে যায়।

নাথুরাম পুনরায় ইঙ্গিত করল, লোকটা মনিরার নাকের ওপর রুমালখানা চেপে ধরলো।

মনিরা দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজিকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলো কিন্তু পারল না সে ধীরে ধীরে অবশ হয়ে এলো তার দেহটা। তারপর ওর আর কিছু মনে রইল না।

❑

বনহুরের আদেশে রহমান তার সমস্ত অনুচরকে ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিল। চৌধুরী মাহমুদ খান সাহেবের কন্যা মনিরাকে খুঁজে বের করতেই হবে। যে তাকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে, সে সর্দারের অত্যন্ত প্রিয় হবে এবং তাকে লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

বনহুরের অনুচরগণ কথাটা শুনে খুশিতে আত্মহারা হল। তেমনি অবাকও হলো তারা। চৌধুরী মাহমুদ খানের কন্যার জন্য আমাদের সর্দারের এত চিন্তা কেন? কথাটা তাদের মনে অনেক রকম প্রশ্ন জাগাল, কিন্তু কেউ সমাধান খুঁজে পেল না।

নূরীও কথাটা শুনে অবাক হলো। ধনবান চৌধুরী মাহমুদ খানের নাম সে অনেক শুনেছে বনহুরের আংগুলে এখন চৌধুরী কন্যা মনিরার হাতের আংটি শোভা পাচ্ছে। বনহুর নূরীকে না দিয়েছে এমন কিছুই নেই, কিন্তু ঐ আংটিটি আজও বনহুর তাকে দিল না। আংটি সম্বন্ধে নূরীও সে জন্য আর কোন কথা বলেনি, যদিও একদিন এই আংটি সম্বন্ধে তার অনেক কৌতূহল ছিল। আজ আবার সেই আংটির কথা স্মরণ হলো তার। তবে কি এর পেছনে কোন রহস্য আছে? নূরী লক্ষ্য করেছে-বনহুর মাঝে মাঝে নির্জনে বসে এই আংটির দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে। তার পদশব্দে চমকে উঠতো, সজাগ হয়ে ফিরে তাকাত নূরীর দিকে।

নূরী কিছু জিজ্ঞাসা করলে হেসে বলতো—কিছু না।

এর বেশি কোন দিন কিছু জানতে পারেনি নূরী। আজ সেই চৌধুরী কন্যার জন্য বনহুরের এত মাথাব্যথা কেন?

বনহুর শিকারীর ড্রেসে সেই যে বেরিয়ে গেছে এখন সন্ধ্যা হয়ে এলো, তবু ফিরে এলো না। নূরী ব্যাকুলচিত্তে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে—কখন ফিরে আসবে বনহুর।

ক্রমে রাত বেড়ে আসছে—নূরী দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় উন্মাদিনীর ন্যায় হয়ে পড়ে। সবচেয়ে তার আপনজন বনহুর—তার ধ্যান-জ্ঞান স্বপ্ন-সাধনা সব। বনহুরকে নূরী নিজের জীবন অপেক্ষা বেশি ভালবাসে।

এক সময় নূরী রহমানের খোঁজে বনহুরের গোপন দরবার কক্ষের দিকে এগুলো ,হয়তো রহমান সেখানেই রয়েছে। কিন্তু নূরী আশ্চর্য হলো-দরবারকক্ষের আশে পাশে আজ কেউ নেই। শুধু দু'জন রাইফেলধারী দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। তাদের কোন প্রশ্ন করা নিরর্থক, কারণ তারা এসবের কিছুই জানে না। নূরী বিমর্ষ মনে ফিরে এলো নিজের কক্ষে। কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে তার মন টিকলো না। আবার ছুটে গেল সে বনহুরের কক্ষে। ওর শূন্য বিছানায় বসে চোখের পানি ফেলল। বনহুরের রিভলবার খানা বুকে চেপে ধরে ওর স্পর্শ অনুভব করতে চাইল।

এমন সময় নূরীর কানে তাজের খুড়ের শব্দ এসে পৌঁছলো নিশ্চয়ই বনহুর ফিরে এসেছে। সে দ্রুত ছুটলো বাইরে।

ক্রমে অশ্বপদশব্দ নিকটবর্তী হচ্ছে। নূরী উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল বনহুরের।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাজের পিঠে বনহুর এসে পৌঁছল। সঙ্গে সঙ্গে নূরী হাত বাড়িয়ে তাজের লাগাম চেপে ধরল। বনহুর ততক্ষণে নেমে দাঁড়িয়েছে।

বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে নূরী চট করে কিছু বলতে পারল না। আজ তার কেমন যেন এক উন্মত্ত চেহারা। নূরীর সঙ্গে কোন কথা না বলেই বনহুর এগুলো দরবারকক্ষের দিকে। নূরী তাকে নীরবে অনুসরণ করল।

দরবারকক্ষের দরজায় পৌছে মেঝের এক স্থানে পা দিয়ে চাপ দিল বনহুর সঙ্গে সঙ্গে দু'টি লোক ছুটে এলো—সর্দার! কুর্ণিশ করে দাঁড়াল তারা।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলো—রহমান ফিরে এসেছে?

লোক দুটির একজন জবাব দিল—না সর্দার, তারা কেউ এখনও ফিরে আসেনি।

এলেই তাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে বলবে—যাও। বনহুর কথাটা বলে বিশ্রামকক্ষের দিকে এগুলো।

নূরী নিশ্চুপ তাকিয়ে দেখছে।

বনহুর যখন বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করলো তখন নূরী তার পাশে যাবে কিনা ভাবছে। মনকে সে কিছুতেই ধরে রাখতে পারছে না। আবার ভয়ও হচ্ছে-হঠাৎ যদি বনহুর তাকে কিছু বলে বসে। নূরী তবু কক্ষে প্রবেশ করলো।

বনহুর কক্ষে পায়চারী করছে।

নূরী একপাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো—হুর, আজ তোমার কি হয়েছে?

বনহুর পায়চারী বন্ধ করে ফিরে তাকালো নূরীর দিকে, তারপর শয্যায় গিয়ে বসলো।

নূরীও গিয়ে বসল তার পাশে। এমনি কতদিন বনহুর নানা কারণে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, নূরী দিয়েছে সান্ত্বনা, মিষ্টি হাসিতে তার মনের দুশ্চিন্তা দূর করার চেষ্টা করেছে সে। আজও সে নূরী বলে—হুর, কি হয়েছে তোমার, বল না?

বনহুর স্থির দৃষ্টি মেলে তাকাল নূরীর দিকে, তারপর বলল—আমার একটি জিনিস হারিয়ে গেছে।

জিনিস হারিয়ে গেছে?

ঠিক হারিয়ে নয়, চুরি গেছে।

চুরি গেছে! কি এমন মূল্যবান জিনিস যার জন্য তুমি এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছ হুর?

সে তুমি বুঝবে না নূরী।

হুর, তোমার মনের ব্যথা আমি সব বুঝি। এই সামান্য কথা আমি বুঝি না। কি এমন জিনিস হারিয়েছে, যার জন্য তুমি লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছো?

কে বললো আমি লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছি?

নূরী কোন জবাব দিল না, কারণ সে সব শুনেছে। বনহুর যে চৌধুরী কন্যার জন্য আজ উন্মাদের মত হয়ে পড়েছে, এ কথা বনহুর তাকে না বললেও অনুমানে বুঝতে পেরেছে নূরী। মনের মধ্যে তার একটা জ্বালা ধরে গেছে। সে ভাবতেও পারে না তার হুর আর কোন নারীকে ভালবাসতে পারে।

একটা ঢোক গিলে জবাব দেয় নূরী, সত্য কোনদিন গোপন থাকে না হুর, চৌধুরী কন্যার জন্য তোমার এত দরদ কেন বলতো?

বনহুর স্তব্ধ চোখে তাকাল নূরীর দিকে। নিঃশ্বাস যেন দ্রুত বইছে ওর। দু'চোখে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে।

নূরী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে—তুমি কিছু না বললেও আমি সব শুনেছি, সব জানি চৌধুরীকন্যার জন্যই আজ তুমি উন্মাদ। তোমার সেই মূল্যবান হারিয়ে যাওয়া জিনিসটি অন্য কিছু নয় সেই যুবতী।

বনহুর নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছে নূরীর কথাগুলো।

নূরী আজ আর থামতে চায় না, ক্ষিপ্তের ন্যায় বলে চলে, হুর তুমি না দস্যু? দস্যু হয়ে একটা যুবতীর প্রেমে...

চিৎকার করে ওঠে বনহুর—নূরী।

তুমি আমাকে ক্ষান্ত করতে পারবে না হুর। আমার গলা ছিঁড়ে ফেললেও আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হবে না। না না, আমি তোমাকে কিছুতেই অন্য কোন নারীকে ভালব .তে দেব না, নূরী বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে-কিছুতেই না। আমি সব সহ্য করতে পারবো হুর, কিন্তু তোমাকে হারানোর ব্যথা সহ্য করতে পারব না। আমি তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি।

বনহুর গম্ভীর মুখে তাকিয়ে রইলো পাশের দেয়ালে। নূরী তার বুকে মুখ লুকিয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠল—হুর, তুমিই যে আমার জীবনের সব।

এমন সময় বাইরে পদশব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই ভেসে এলো রহমানের কণ্ঠস্বর—সর্দার

নূরী তাড়াতাড়ি চোখের পানি মুছে সরে দাঁড়াল।

বনহুর আজ রহমানকে তার কক্ষে প্রবেশ করার আদেশ না দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল, নূরীর কানে পৌঁছল বনহুরের কণ্ঠস্বর—চলো।

রহমান আর বনহুরের পদশব্দ মিলিয়ে যেতেই নূরী বেরিয়ে এলো, অন্ধকারে উঁকি দিয়ে দেখলো-দু'টি ছায়ামূর্তি ওদিকে বেরিয়ে যাচ্ছে। নূরী বুঝতে পারলো বনহুর আর রহমান ঐ সঙ্গে

কোন আলোচনা করতে চায় না। তাই সরে যাচ্ছে দূরে। কিন্তু নূরীও কম মেয়ে নয়—যেমন করে হউক সেও শুনবে, রহমান কি খবর এনেছে।

অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলল নূরী, অন্ধকারে একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

বনহুর আর রহমান দরবার কক্ষের দিকে না গিয়ে সামনে একটা গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল।

নূরীও হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের আড়ালে এসে লুকিয়ে পড়ল।

বনহুর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলো—রহমান, তুমি নিজেও বেরিয়েছিলে?

হ্যাঁ সর্দার।

কোন সন্ধান পেলে না?

না, আজ সারাটা দিন গোটা শহর চষে বেড়িয়েছি।

শহরময় চষে বেড়ালেই তাকে পাওয়া যাবে না রহমান। এমন কোন গোপন স্থানে তাকে আটকে রাখা হয়েছে, যেখানে কেউ তার সন্ধান পাবে না।

সর্দার, আমি ঝাড়ুদারের বেশে অনেক অন্দরবাড়িতেও প্রবেশ করি। গিয়েছি হোটেলে, ক্লাবে দোকানে কিন্তু কোন আভাসই পেলাম না।

তোমার সঙ্গীরা সবাই ফিরে এসেছে?

অনেকে এসেছে-অনেকে আসেনি। কেউ কোন সন্ধান বলতে পারছে না। ওদের ডাকব?

না, আমার কাছে ডেকে কোন লাভ নেই। হ্যাঁ, আমিও তাকে অনেক খুঁজলাম-তুমি গিয়েছিলে ঝাড়ুদারের বেশে আর আমি গিয়েছিলাম শিকারীর বেশে।

সে আমি দেখতেই পাচ্ছি সর্দার।

তুমি ঘুরেছ অন্দরবাড়ি, হোটেলে, ক্লাবে আর দোকানে।

আমি ঘুরেছি বন থেকে বনান্তরে। গহন বনের অন্তরালে পর্বতের প্রত্যেকটা গুহায়। তবু তার সন্ধান পেলাম না।

সর্দার, আপনি বড় ক্লান্ত।

শুধু আমি নই রহমান, তাজের পরিশ্রম আমার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে। ওর সেবার জন্য করিমকে বলে দাও।

নূরী আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। চৌধুরীকন্যার জন্য বনহুরের ব্যাকুলতা তার হৃদয়কে খান খান করে দেয়। নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে সে।

বনহুর বলে—রহমান, অল্পক্ষণের মধ্যে আবার বেরুবো, তুমি আমার গাড়ি বড় রাস্তায় তৈরি রাখতে বল।

আবার এক্ষুণি বের হবেন?

হ্যাঁ। যতক্ষণ তার সন্ধান খুঁজে না পাব, ততক্ষণ আমার বিশ্রাম নেই।

নূরী এবার বুঝতে পারে বনহুর হঠাৎ আজ এমন শিকারীর বেশে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কোথা গিয়েছিল? সব পরিষ্কার হয়ে যায় আজ তার কাছে।

বনহুর কক্ষে ফিরে আসে। এবার সে সুন্দর, এক সাহেবের বেশে সজ্জিত হয়। গায়ে দামী সুট, মাথায় ইংলিশ ক্যাপ, হাতে দামী সিগারেট।

নূরী আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। এই ড্রেসে বনহুরকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। এখন কে তাকে দেখলে বুঝতে পারবে না সে বাঙালি। ঠিক সাহেবের মতই মনে হলো তার চেহারা।

নূরী কিন্তু নিশ্চুপ রইল না। সে বনহুরের ড্রাইভারের বেশে সেজে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। নিজকে নিজেই চিনতে পারে না নূরী। সত্যি আজ তার ছদ্মবেশ সার্থক হয়েছে। কিন্তু

বনহুর কক্ষ ত্যাগ করার পূর্বেই নূরী রহমানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

রহমান আশ্চর্যকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো— মকসুদ, তুমি এখনো গাড়িতে যাওনি! সর্দারের আদেশ পালন করনি তুমি?

নূরী চাপাকণ্ঠে বললো—রহমান, আমি নূরী।

সে কি, তুমি।

হ্যাঁ, আমি আজ হুরের গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে যাব।

এত রাত-বিরাতে গাড়ি চালাতে পারবে, তুমি?

পারবো। তুমি তো জানোই, আমি খুব ভাল মোটর ড্রাইভিং শিখেছি।

কিন্তু সর্দার যদি জানতে পারে?

সে ভয় তোমার নেই। তুমি শুধু আমাকে গাড়িতে নিয়ে পৌঁছে দাও।

নূরী, এটা কি ঠিক হবে?

যা হয় হবে, তুমি একটা অশ্ব আমার জন্য দাও।

রহমান একজন অনুচরকে ডেকে বললো একটা অশ্ব সেখানে নিয়ে আসতে।

নূরী যখন গাড়িতে পৌঁছল তখন ড্রাইভার আশ্চর্য হলো, বললো—কে তুমি?

রহমান নূরীকে পৌঁছে দেবার জন্য গিয়েছিল-সে-ই সব কথা খুলে বললো, তারপর ড্রাইভারকে সরিয়ে নিল।

নূরী ড্রাইভার আসনে চেপে বসতেই তাজের পিঠে বনহুর এসে পৌঁছল।

বনহুরকে দেখতে পেয়েই রহমান আসল ড্রাইভারকে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ার জন্য ইংগিত করল। ড্রাইভার রহমানের কথামত আত্মগোপন করল।

রহমান তাজের লাগাম চেপে ধরে বললো—সর্দার, তাজকে কি আবার পাঠাবো?

না, তাজ আজ বিশ্রাম করবে।

ততক্ষণে ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে।

বনহুর ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলল—নাইট ক্লাবে চলো।

নূরী একদিন বনহুরের সঙ্গে নাইট ক্লাব দেখার জন্য এসেছিল অবশ্য ভেতরে প্রবেশ করেনি। আজ সেদিনের আসরে স্বার্থকতা উপলব্ধি করে। ভাগ্যিস সেদিন এসেছিল সে। তার নাইট ক্লাবের পথটা চিনতে কষ্ট হয় না।

বনহুর পেছন আসনে বসে সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছে। বনহুরের পরিত্যাক্ত ধুম্রকুণ্ডগুলো ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ড্রাইভারের চোখে মুখে এসে ঝাপটা দিচ্ছিলো। ড্রাইভার নিশ্চুপ গাড়ি চালিয়ে চলেছে।

রাত তখন দশটা বেজে গেছে। শীতের রাত-শহরের পথঘাট প্রায় জনশূন্য হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে দু'একটা গাড়ি তাদের গাড়ির পাশ কেটে চলে যাচ্ছে। ড্রাইভার সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালাচ্ছে। সে তো আর দক্ষ ড্রাইভার নয়। তবু গাড়ি চালনায় কোন ভুল হচ্ছে না তার।

গাড়িখানা এক সময় নাইট ক্লাবে এসে থেমে পড়লো।

বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো।

ড্রাইভার তার পূর্বেই ড্রাইভ আসন থেমে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরেছিল। বনহুর নেমে যেতেই সে গাড়ির দরজা বন্ধ করে গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। এমন স্থানে দাঁড়াল সে, যেখান থেকে ক্লাবের গোটা অংশ নজরে পড়ে।

ক্লাবের ভেতর থেকে তখন একটা ইংলিশ গানের সুর ভেসে আসছে। আর ভেসে আসছে হাসি আর বোতলের ঠন ঠন শব্দ।

বনহুর ক্লাবে প্রবেশ করতেই তাদের গাড়ির পাশে আর এক খানা গাড়ি এসে থেমে পড়ল গাড়ি থেকে নামলেন দু'জন ভদ্রলোক যদিও তাঁদের শরীরে স্বাভাবিক স্যুট কিন্তু আসলে তাঁরা পুলিশের লোক একজন মিঃ হারুন, অন্যজন মিঃ হোসেন। তাঁরাও ক্লাবে প্রবেশ করলেন।

নূরী ড্রাইভারের বেশে সব লক্ষ্য করছে। শুধু বনহুরই তার লক্ষ্য নয়, সেও অনুসন্ধান করে দেখছে চৌধুরী কন্যার খোঁজ সে পায় কিনা।

মিঃ হারুন আর মিঃ হোসেনের গতিবিধি নূরীর কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়। সে গোপনে ওদের দু'জনকে অনুসরণ করে। ক্লাবের একপাশে দাঁড়িয়ে সব দেখতে লাগলো নূরী। ক্লাবের মধ্যে কোনদিন সে প্রবেশ করেনি-অবাক হয়ে সব দেখছে। ক্লাবে এদের দেখে নূরীর চোখে ধাঁধা লেগে যায়। এখানে নারী পুরুষ কোন ভেদাভেদ নেই। গায়ে পড়ে ঢলাঢলি হাসাহাসি করছে। কি সব খাচ্ছে। কোথাও বা জুয়ার আড্ডা বসেছে। ওদিকে কতকগুলো মেয়ে পুরুষ এক সঙ্গে নাচছে। নূরীর মনে পড়লো, বনহুর তাকে একদিন বলেছিল ক্লাবে মেয়ে পুরুষ মিলে বলডান্স হয় বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে দেখে নূরী সব।

কিন্তু হুর কোথায়, তাকে তো দেখা যাচ্ছে না।

যে লোক দু'টির অনুসরণ করে নূরী ক্লাবে প্রবেশ করেছে, তারা ওদিকের একটা টেবিলের পাশে দু'খানা চেয়ারে বসেছেন। চার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছেন তাঁরা।

বয় দুটো প্লেটে করে কি রেখে গেল। খেতে খেতে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন ওরা।

নূরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে বনহুরের অনুসন্ধান করছে। হঠাৎ তার নজর পড়লো ওদিকের একটা পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এলো বনহুর। তার পাশে একটি যুবতী। বনহুরের সঙ্গে কিছু আলাপ করছে সে। বনহুর এগুতেই যুবতী ওর দক্ষিণ হাত ধরে বসিয়ে দিল খালি একটা চেয়ারে। তারপর টেবিলস্থ বোতল থেকে খানিকটা তরল পদার্থ ঢেলে বনহুরের দিকে এগিয়ে ধরলো।

শিউরে উঠলো নূরী। বাঁকা চোখে একবার তাকাল-সত্যই কি হুর এ তরল পদার্থ গলধঃকরণ করবে।

বনহুর যুবতীর হাত থেকে কাচপাত্রটা নিল। নূরীর হৃদয়ে প্রচণ্ড একটা হাতুড়ির ঘা পড়লো। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে তাকিয়ে আছে। বনহুর দস্যু-ডাকু কিন্তু মাতাল নয়। আজ থেকে সে মাতাল হবে? চৌধুরী কন্যাকে ভুলবার জন্য সে মদ খাবে অসম্ভব।

বনহুর কাঁচপাত্রটা মুখের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। এইবার সে ঠোঁটে চেপে ধরবে-হঠাৎ নূরী দেখল তার হাত থেকে পাত্রটা মাটিতে পড়ে সশব্দে ভেঙে গেল।

নূরীর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্ত হলো। খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাল সে।

সেই মুহূর্তে যুবতী নাচতে শুরু করল বনহুরের সামনে নাচছে সে। বনহুরের দৃষ্টি চক্রাকারে ক্লাবের প্রতিটি লোকের মুখে ঘুরপাক খেয়ে ফিরছে।

হঠাৎ বনহুরকে উত্তেজিত মনে হলো যুবতী তখনও নেচে চলেছে। বনহুরের দৃষ্টি ও পাশে কয়েকটি লোকের ওপর সীমাবদ্ধ যারা এতক্ষণ গোল টেবিলটা জুড়ে জুয়ার আড্ডা দিচ্ছিল।

নূরীও তাকালো লোকগুলোর দিকে।

দেখতে পেল-কয়েকজন ভীষণ চেহারার লোক একটা যুবককে পাকড়াও করেছে। একজন বলিষ্ঠ লোক যুবকের জামার কলার চেপে ধরেছে।

মারামারি বাঁধবার পূর্বলক্ষণ।

এক মুহূর্ত বিলম্ব হলো না, ভীষণ ধস্তাধস্তি শুরু হলো, সারা কক্ষে একটা হট্টগোল ছড়িয়ে পড়ল।

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে বনহুর। দ্রুত পদক্ষেপে এগুলো সে ঐখানে। যুবতী বনহুরের সামনে গিয়ে পথ আগলে বাধা দিল, কিন্তু বনহুর তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল। কোন রকম দ্বিধা না করে একজনের নাকের ওপর প্রচণ্ড ঘুষি লাগাল।

গুডাগোছের লোকগুলো এবার যুবকটাকে ছেড়ে আক্রমণ করল বনহুরকে। সবাই মিলে একসঙ্গে বনহুরের সঙ্গে লড়াই লেগে পড়ল।

নূরীর মুখ বিষণ্ন হলো। হঠাৎ এমন অবস্থার জন্য সে ভীষণ ঘাবড়ে গেল। বনহুরের অমঙ্গল আশংকায় আশংকিত হলো সে।

ততক্ষণে তুমুল যুদ্ধ বেঁধে গেছে কিন্তু বনহুরের সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ ব্যাপার নয়। গুণ্ডা অন্যপক্ষে সাত আটজনের বেশি হবে—আর বনহুর একা কিন্তু অল্পক্ষণে বনহুর সকলকে পর্যুদস্ত করে ফেলল। কে কোনদিকে পালাবে পথ খুঁজছে এমন সময় মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন রিভলবার হাতে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মিঃ হারুন বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, খবরদার, নড়েছ কি মরেছ।

গুণ্ডালোকগুলো হাত তুলে দাঁড়াল।

মিঃ হারুন বাঁশি বাজালেন, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পুলিশ ক্লাবে প্রবেশ করে গুণ্ডা লোকগুলোর হাতে হাতকড়া পড়িয়ে দিল।

এবার মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন নিজেদের পরিচয় দিয়ে বনহুরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। তাঁরা বারবার ধন্যবাদ জানালেন তাকে।

অবশ্য পরিচয় দেবার পূর্বেই মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেনকে চিনতে পেরেছিল বনহুর। সেও হেসে তাদের অভিনন্দন জানালো। মিঃ হারুন বলেন-আপনার পরিচয়?

বনহুর কিছুমাত্র না ভেবে চট করে জবাব দিল-আমি বিদেশী ব্যবসায়ী। আমার নাম মিঃ প্রিন্স।

মিঃ হারুন খুশি হয়ে বলেন-আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মিঃ প্রিন্স। নামের সঙ্গে আপনার চেহারার মিল রয়েছে। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় অনেক খুশি হয়েছি।

মিঃ হোসেনও আনন্দ প্রকাশ করলেন।

ততক্ষণে গুণ্ডা লোকগুলোকে পুলিশ পাকড়াও করে পুলিশ ভ্যানে উঠিয়ে নিয়েছে।

মিঃ হোসেন বলেন—মিঃ হারুন, আমার সন্দেহ হয়, এরা নিশ্চয়ই দস্যু বনহুরের অনুচর।

মিঃ হোসেন বললেন—এ রকম সন্দেহের কারণ?

দেখলেন না লোকগুলোর চেহারা ঠিক ডাকাতের মত?

বনহুর শুনে নীরবে হাসলো।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন বেরিয়ে যেতেই বনহুর যুবকটার পাশে এসে দাঁড়ালো গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো সে—আপনার পরিচয়।

যুবকটার চেহারায় বেশ আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে। উজ্জ্বল দীপ্ত মুখমণ্ডল। বয়স বনহুরের চেয়ে কম হবে। পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবী। সে হিন্দু তা বেশ বুঝা যাচ্ছে। বনহুরের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো সে— আমার নাম মধু সেন। আমার পিতা মাধবগঞ্জের জমিদার বিনোদ সেন।

বনহুর হাসলো, তারপর কঠিন কণ্ঠে বললো—আপনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সন্তান, আপনি এসেছেন ক্লাবে, ছিঃ। আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি—খবরদার আর কোনদিন এ পথ মাড়াবেন না, বুঝেছেন।

বুঝেছি, সত্যি আপনি না থাকলে আজ...

যান-বেরিয়ে যান ক্লাব থেকে। কোন কথাই আমি শুনতে চাইনা। আপনাদের মত লোকের কৃতজ্ঞতাকেও আমি ঘৃণা করি।

যুবক মধু সেন নতমস্তকে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

বনহুর এবার এগুলো নিজের গাড়ির দিকে।

ড্রাইভার পূর্বেই ড্রাইভ আসনে বসেছিল।

বনহুর গাড়িতে চড়ে বসতেই স্টার্ট দেয়। বনহুর বলে লেকের ধারে চলো।

ড্রাইভার অস্বস্তি বোধ করে। এত রাতে আবার লেকের ধারে কেন? ক্লাবে আসার সখ মিটলো-এবার লেকের ধারে। ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

গাড়ি ছুটে চলেছে। রাত এখন দুটোর কম হবে না। শির শিরে হিমেল হাওয়ায় ড্রাইভারের শরীরে কাঁপন লাগে, রাগ হয় বনহুরের ওপর-লেকের ধারে কি করতে যাবে সে?

গাড়িখানা সাঁকোর উপর উঠতেই সহসা তাদের পাশ কেটে বেরিয়ে গেল আর একখানা গাড়ি। বনহুর হঠাৎ ঝুঁকে গাড়ি খানাকে লক্ষ্য করলো। তারপর ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বললো ড্রাইভার যে গাড়িটা আমাদের গাড়িকে পেছনে ফেলে চলে গেলো, ওটাকে ফলো কর।

নূরী গাড়ি চালাতে জানে, তা বলে খুব দক্ষ ড্রাইভারের মত চালাতে জানে না। বিপদে পড়ল নূরী। তবু সে যতদূর সম্ভব স্পীডে গাড়ি চালাতে শুরু করল।

বনহুর কি যেন ভাবলো তারপর সে ড্রাইভারের পাশে বসে হ্যান্ডেল চেপে ধরল। অন্য কোনদিকে খেয়াল করার সময় নেই বনহুরের। সামনের গাড়িখানাকে ফলো করতেই হবে। কারণ গাড়িখানার গতিবিধি তার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হল।

ড্রাইভার সরে বসল।

বনহুর ডবল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে। উল্কাবেগে ছুটছে গাড়িখানা।

সম্মুখস্থ গাড়িখানা তখন বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। বনহুর নাছোড়বান্দা-ঐ গাড়িকে সে ধরবেই।

পথটা বেশ নির্জন এবং চওড়া । তাছাড়া পথের দু'পাশে লাইটপোষ্ট থাকায় গাড়ি চালাতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না।

নূরীর মনে কিন্তু খুব ভয় হচ্ছে, না জানি হঠাৎ কোন এক্সিডেন্ট হয়ে বসে। পথের দু'ধারে বাড়িগুলো সাঁসাঁ করে সরে যাচ্ছে। হিমঝরা শীতের রাত-তাই কোন বাড়ির দরজা জানালা খোলা নেই। বাড়িগুলোও যেন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ঘুম পাড়ছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রথম গাড়িখানা বুঝতে পারলো পেছনের গাড়ি তাকে অনুসরণ করছে।

বনহুর অতি কৌশলে নিজের গাড়িখানাকে সামনের গাড়ির সামনে এনে অবরোধ করে ফেলল।

সামনের গাড়িখানা উপায়ান্তর না দেখে ব্রেক করে থামিয়ে ফেলল।

বনহুর ড্রাইভ আসন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। ততক্ষণে প্রথম গাড়ির চালকও গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়েছে।

বনহুরকে সে-ই প্রথম আক্রমণ করল।

বনহুর প্রচন্ড এক ঘুষিতে লোকটাকে ধরাশায়ী করল।

বনহুর তক্ষণি বুঝতে পারলো—যাকে সে এই মুহূর্তে ধরাশায়ী করেছে সে নাথুরাম ছাড়া কেউ নয়। বনহুর একবার যাকে দেখতো তাকে ভুলতো না কোনদিন। নাথুরামকে তো সে কয়েকবার কাবু করেছে। তাই আজও অন্ধকারে অনুমান করে নেয়। বনহুরের রাগ আরও বেড়ে যায় শয়তান নাথুরামই তার মনিরাকে আর একবার নদীপথে নিখোঁজ করতে চেয়েছিল।

বনহুর ঝাঁপিয়ে পড়লো নাথুরামের ওপর। দু'হাতে ওর টুটি টিপে ধরল।

কিন্তু নাথুরামকে কাবু করা অত সহজ ব্যাপার নয়। সেও মরিয়া হয়ে বনহুরের গলা চেপে ধরল। আবার শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ।

নূরী কোনদিন এমনভাবে বনহুরকে তার সামনে যুদ্ধে লিপ্ত হতে দেখেনি। আজ ক্লাবে গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়াই করতে দেখে নূরী স্তম্ভিত হতবাক হয়েছিল। সাত আটজন বলিষ্ঠ লোকের সঙ্গে একা বনহুর শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো সে। এক্ষণে বনহুর নাথুরামের সঙ্গে লড়াইয়ে জয়ী হবে, এ-তো জানেই সে। তবুও সে ভীত হয়ে পড়ছিল। বনহুরের কোন ক্ষতি হয় এই আশংকায় মনে প্রাণে খোদাকে স্মরণ করছিল সে। নূরী তখন গাড়ির পেছন আসনে বসেছিল।

নাথুরাম আর পেরে উঠছিল না, বনহুরের প্রচন্ড ঘুষিতে তার নাক দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ছিলো। সে তবু মরিয়া হয়ে লড়াই করছিল আর পালাবার পথ খুঁজছিল। শয়তান নাথুরাম হঠাৎ একমুঠো ধুলো তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো বনহুরের চোখ লক্ষ্য করে।

আচমকা চোখে ধুলোবালি এসে পড়ায় একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো বনহুর—সঙ্গে সঙ্গে চোখ রগড়ে তাকাল। ততক্ষণে নাথুরাম বনহুরের দৃষ্টির আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে। বনহুর অন্ধকারে তীক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে লক্ষ্য করতে লাগল, শুধু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না।

এবার এগিয়ে গেল বনহুর নাথুরামের গাড়ির দিকে। আশা আকাঙ্খায় মনটা তার দুলে উঠলো। হয়তো ঐ গাড়ির মধ্যে মনিরা থাকতে পারে। গাড়ির মধ্যে উঁকি দিয়ে আশ্চর্য হলো বনহুর। একটা লোক হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় গাড়ির মেঝেতে পড়ে রয়েছে। বনহুর বিলম্ব না করে গাড়ির দরজা খুলে গাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলো। যদিও লোকটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না তবুও অনুমানে বুঝে নিলো নিশ্চয়ই কোন ভদ্রলোককে শয়তান নাথুরাম বন্দী করে নিয়ে চলেছে।

বনহুর তাড়াতাড়ি তাঁর হাত পা মুখের বাঁধন খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকটি উঠে বসলেন, তিনি আনন্দসূচক কণ্ঠে বললেন— কে আপনি? আমাকে বাঁচালেন।

বনহুর ভদ্রলোকটির গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠলো এ যে প্রখ্যাত ডিটেকটিভ মিঃ শঙ্কর রাওয়ের গলা। সে পকেট থেকে ছোট্ট টর্চলাইটটা জ্বেলে দেখলো তার অনুমান মিথ্যা নয়। শংকর রাওয়ের একি অবস্থা-চোখ বসে গেছে, চুল এলোমেলো, কোট প্যান্ট টাই মলিন-নোংরা।

বনহুর মুখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন মিঃ রাও—কে আপনি? আমাকে রক্ষা করলেন? এই জঘন্য অবস্থা থেকে বাঁচালেন?

বনহুর জবাব দিল—আমি একজন ব্যবসায়ী। আমার নাম মিঃ প্রিন্স।

মিঃ রাও বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা দু'হাত চেপে ধরলেন আপনি আমার জীবন রক্ষা করলেন, আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো মিঃ প্রিন্স আপনি ....

থাক, ওসব পরে হবে। এখনও আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ নন। আসুন আমার গাড়িতে আপনাকে পৌছে দিই।

শংকর রাওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ড্রাইভ আসনে বসে বনহুর তারপর ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলে— ড্রাইভার, তুমি সামনের আসনে এসে বসো।

নূরী এতক্ষণ নির্বাক পুতুলের মত স্তব্ধ হয়ে বসে বসে দেখছিল। বনহুরের প্রতি একটা অভিমান জমেছিল তার মনে, এক্ষণে তা কোথায় উড়ে গেছে। ড্রাইভারের সঙ্গে বনহুর তো কোনদিন এভাবে কথা বলে না। মনে মনে একটু আশ্চর্য হয় নূরী। পেছন আসন থেকে সামনের আসনে এসে বসে সে।

মিঃ শংকর রাওকে নিয়ে বনহুর যখন গাড়িতে স্টার্ট দিল, তখন নাথুরাম মাথা তুলে একবার তাকালো। গাড়িখানা দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলে শরীরের ধুলো ঝেরে উঠে দাঁড়ালো নাথু। তখনো নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে তার। দাঁতে দাঁত পিষে গাড়িখানার দিকে চেয়ে রইলো সে।

বনহুর গাড়ি চালাতে চালাতে বললো—মিঃ রাও, আপনি কোথায় যাবেন? অফিসে না বাসায়?

মিঃ শংকর রাও অচেনা অজানা মিঃ প্রিন্সের মুখে তার নাম শুনে আশ্চর্য হলেন। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলেন—বাসায় যাব। ক্ষুধায় আমার অবস্থা শোচনীয়। আজ এক সপ্তাহের মধ্যে পানি ছাড়া আর কিছু আমার ভাগ্যে জোটেনি। কিন্তু একটা কথা মিঃ প্রিন্স, আপনি আমাকে চিনলেন কি করে?

হেসে বললো বনহুর—আপনি একজন প্রখ্যাত ডিটেকটিভ, আপনাকে চিনতে কারও ভুল হয় না। আচ্ছা মিঃ রাও, আপনার উধাও ব্যাপারটা সংক্ষেপে যদি বলতেন-

ঘটনাটা সত্যি অতি বিস্ময়কর। আমি দস্যু বনহুরের চক্রজালে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

দস্যু বনহুর।!

হ্যাঁ, মিঃ প্রিন্স, শয়তান দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করতে গিয়ে আপনি নিজেই পাকড়াও হয়ে পড়েছিলেন বুঝি?

কথার ফাঁকে গাড়িখানা এসে পৌঁছে গেল মিঃ রাওয়ের বাসার গেটে।

শংকর রাও গাড়ি থেকে নেমে আনন্দভরা কণ্ঠে বলেন— আসুন মিঃ প্রিন্স, কি বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো।

থাকা আজ আর নামবো না, সময় পেলে আবার দেখা হবে।

শংকর রাও বলে ওঠেন—আপনার ঠিকানা যদি দয়া করে শুনাতেন, তাহলে মিঃ হারুনকে নিয়ে-

ও! বেশ এই নিন। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে বনহুর মিঃ শংকর রাওয়ের হাতে দেয়। তারপর গাড়িতে স্টার্ট দেয় সে।

গাড়ি স্পীডে ছুটে চলেছে।

পাশে বসে আছে ড্রাইভারবেশী নূরী। ওর মনে নানারকম প্রশ্নের উদ্ভব হচ্ছে। আজ সে বনহুরের সঙ্গে এসে স্বচক্ষে যা দেখল এবং অনুভব করল, তা অতি বিস্ময়কর। নূরী এসব কল্পনাও করতে পারেনি। বনহুর যে শুধু সেই চৌধুরী কন্যাকে নিয়েই উন্মত্ত রয়েছে তা নয়। বাইরের সমগ্র জগৎ জুড়ে তার কাজ। অনাবিল এক আনন্দে আপ্লুত হয় নূরীর হৃদয়। বনহুরকে সে যতখানি গণ্ডির মধ্যে কল্পনা করেছে তার চেয়ে সে অনেক, অনেক বেশি।

নীরবে গাড়ি চালাচ্ছিল বনহুর। রাত প্রায় শেষের পথে। শীতের কনকনে হাওয়া শার্সীর ফাঁকে প্রবেশ করছিল না সত্য কিন্তু তবু একটা জমাট ঠান্ডা নূরীকে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। জনশূন্য পথ। পথের দু'ধারে লাইটপোষ্টের আলোগুলো নীরব প্রহরীর মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লাইটপোষ্টের আলোগুলো কেমন ঝাপসা কুয়াশাচ্ছন্ন।

গাড়ির মধ্যে শুধু দুটি প্রাণী—বনহুর আর নূরী।

নূরী এতক্ষণ কোন কথা না বলায় হাঁপিয়ে পড়েছিল। গাড়িতে চাপার পর থেকে সেই মুখ বন্ধ হয়েছে, এখনও সে নিশ্চুপ।

হঠাৎ বনহুর বলে ওঠে—তোমার সখ দেখে আমি সত্যি আশ্চর্য হলাম।

নূরী চমকে উঠলো, বনহুর কি তাকে চিনতে পেরেছে। নিশ্চয়ই তাই হবে। একবার আড় নয়নে বনহুরকে দেখার চেষ্টা করল সে। বনহুর এবার মৃদু হাসলো—নূরী, তুমি আজ এসে ভালই করেছ। তুমি পাশে থাকায় আমি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।

নূরী স্তব্ধকণ্ঠে অস্ফুটধ্বনি করে উঠে—হুর।

গাড়িতে যখন প্রথম স্টার্ট দিলে তখনই আমি তোমাকে চিনে নিয়েছি।

কেন তবে তুমি আমায় নামিয়ে দিলে না?

তোমার মনের দ্বন্দ্ব দূর হয়েছে তো?

হুর, আমি তোমাকে কোনদিন অবিশ্বাস করিনি।

আজ কেন তবে তুমি আমাকে অনুসরণ করেছিলে?

নূরী বনহুরের হাতের ওপর হাত রেখে—তুমি আমাকে ক্ষমা করো হুর, না জেনে আমি তোমাকে ভুল বুঝেছি।

নূরী!

বল?

জানি তুমি আমায় ভালবাস। কিন্তু তার বিনিময়ে আমি তোমাকে....

না না হুর, আর তুমি কিছু বল না। আমি সহ্য করতে পারবো না হুর। নূরী বনহুরের কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

নূরীর হৃদয়ের ব্যথা বনহুরের মনে যে আঘাত করে না তা নয়। দস্যু হলেও সে মানুষ, তার চোখ দুটোও ঝাপসা হয়ে আসে।

গাড়ি ততক্ষণে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেছে।

বনহুর নেমে দাঁড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে ধরে বলে—এসো।

নূরী নেমে দাঁড়ায় বনহুরের পাশে।

গতরাতে অফিস থেকে ফিরতে মিঃ হারুনের রাত প্রায় চারটে বেজে গিয়েছিল। গুণ্ডাগুলোকে হাজতে রেখে অফিসের খাতাপত্র ঠিক করে তবেই তিনি ফিরেছিলেন। ভোরের দিকে ঘুমটা একটু জেঁকে এসেছে—এমন সময় পাশের টেবিলে ফোনটা বেজে উঠলো।

মিসেস হারুন একটু সকাল সকাল উঠেছেন। তিনি স্বামীকে না জাগিয়ে নিজেই ফোন ধরলেন —হ্যালো কে মিঃ হোসেন? পুলিশ অফিস থেকে বলছেন? ব্যাপার কি? না উনি এখনও ওঠেন নি। আপনিও তো খুব রাত করে বাড়ি ফিরেছেন, আবার এত সাত সকালে অফিসে? কি বলেন—মিঃ রাও ফিরে এসেছেন। সবুর করেন, উনাকে ডেকে দিচ্ছি কি আশ্চর্য। রিসিভারের মুখে হাত রেখে ডাকলেন ওগো শুনছো, শোন শোন মিঃ রাও নাকি ফিরে এসেছেন।

এ্যাঁ এত চেঁচাচ্ছো কেন? পাশ ফিরে শুয়ে কথাটা বলেন মিঃ হারুন। মিসেস হারুন পুনরায় বলেন—ওঠো, ওঠো, শোন মিঃ রাও ফিরে এসেছেন।

কি বললে, মিঃ রাও ফিরে এসেছেন? এক লাফে শয্যা ত্যাগ করে স্ত্রীর হাত থেকে রিসিভার কেড়ে নিয়ে কানে ধরলেন--- হ্যালো .... কি বলেন মিঃ রাও ফিরে এসেছেন। আচ্ছা আমি এক্ষুনি আসছি।

রিসিভার রেখে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ হারুন—ওগো, আমার জামা কাপড়গুলো এগিয়ে দাও তো।

সে কি, হাত মুখ ধোবে না? নাস্তা করবে না?

রেখে দাও তোমার হাতমুখ ধোয়া আর নাস্তা খাওয়া। কি আশ্চর্য যাকে আজ ক'দিন পুলিশ অহরহ খুঁজে বেড়াচ্ছে যার তল্লাশে সমস্ত পুলিশ বিভাগ আহার নিদ্রা বিশ্রাম ত্যাগ করেছে এমনকি পুলিশ সুপার পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন—সে শংকর রাওয়ের আবির্ভাব-একি কম কথা?

জামাকাপড় পরে মিঃ হারুন যখন পুলিশ অফিসে পৌঁছলেন তখন সকাল সাতটা বেজে গেছে। অফিসে লোক ধরছে না। মিঃ হারুনকে দেখে সবাই পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো।

মিঃ হারুন কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন একটা চেয়ারের উস্কুখুস্কচুল, কোটরাগত চোখ-উত্তেজিতভাবে বসে আছেন মিঃ রাও। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন কয়েকজন পুলিশ অফিসার

মিঃ হোসেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। মিঃ হারুনকে দেখে মিঃ হোসেন বলেন—গুড মর্নিং মিঃ হারুন। আজ আমাদের সুপ্রভাত।

মিঃ হারুন মিঃ হোসেনের সাথে হ্যান্ডশেক করে মিঃ রাওয়ের সামনে এসে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। তারপর শংকর রাওয়ের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বলেন— স্ত্রীর ঔষুধ আনতে গিয়ে কোথায় উধাও হয়েছিলেন মিঃ রাও?

শংকর রাও কিছু বলার পূর্বেই বলে ওঠেন মিঃ হোসেন— উনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আমি উনার মুখে যা শুনলাম বলছি।

বলুন?

মিঃ রাওয়ের কাছে শোনা সমস্ত ঘটনা মিঃ হোসেন ইন্সপেক্টার মিঃ হারুনের কাছে বলেন। আরও বলেন—মিঃ রাও ভেবেছিলেন তিনি দস্যু বনহুরের অনুচরের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। কিন্তু তা নয়। মিঃ রাওয়ের উধাওয়ের ব্যাপারে দস্যু বনহুর নেই বা ছিল না বরং তাকে উদ্ধার করেছে দস্যু বনহুর।

মিঃ হারুন— দস্যু বনহুর আমাকে রক্ষা করেছে। আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। সেই মুহূর্তে সে যদি আমাকে উদ্ধার না করতো, তাহলে আমার বাঁচার কোনা আশা ছিল না।

শংকর রাও কথাগুলো বলতে বেশ হাঁপিয়ে পড়ছিলেন। তিনি পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে, মিঃ হারুনের হাতে দিলেন—দস্যু বনহুর চলে যাওয়ার সময় এই কাগজখানা আমাকে দিয়ে গেছে।

মিঃ হারুন কাগজখানা তুলে ধরলেন চোখের সামনে, তাতে লেখা রয়েছে মাত্র দু'টি শব্দ—'দস্যু বনহুর'।

মিঃ হারুন জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি তার পরিচয় জানতে চাননি?

চেয়েছিলাম, সে নিজের নাম মিঃ প্রিন্স বলেছিল। সত্যি মিঃ হারুন দস্যু বনহুরকে যুবরাজের মতই দেখাচ্ছিল।

হ্যাঁ, সে প্রিন্সের মতই দেখতে। কথাটা বলেন মিঃ হারুন। তারপর একটু ভেবে বলেন—তাহলে যে দস্যু বা ডাকু আপনাকে উধাও করেছিল সে বনহুরের দলের নয়?

না মিঃ হারুন, আমি এ কদিনে বেশ উপলব্ধি করেছি যারা আমাকে পাকড়াও করেছিল তারা শুধু দস্যুই নয়, নারী হরণকারী দলও আমার মনে হয়, চৌধুরী কন্যাও তাদের হাতে বন্দী রয়েছে।

অনুমানে কিছু বলা যায় না, মিঃ রাও। চৌধুরী কন্যাকে কেউ পাকড়াও করে নিয়ে গেছে, না সে নিজেই গেছে তার সঠিক সন্ধান এখনও হয়নি।

মিঃ রাও বলেন— আমি যেসব প্রমাণ পেয়েছিলাম তাতে নিঃসন্দেহে বলতে পারি মিস মনিরাকে জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাছাড়া তাদের বাড়ির পুরোন দারোয়ান খুন হওয়ার পেছনে রয়েছে একমাত্র ঐ কারণ।

মিঃ রাও এমনও তো হতে পারে-বনহুর নিজে না এসে লোক দিয়ে কার্য সিদ্ধি করেছে এবং দারোয়ানকে খুন করিয়েছে। যাক সে সব কথা-এখন আপনি পূর্ণমাত্রায় বিশ্রাম গ্রহণ করুন। সুস্থ হলে কাজের কথা হবে।

শংকর রাও বলেন—বিশ্রাম নেবার সময় কই আমার মিঃ হারুন, আমি এই অবস্থাতেই কাজে নামতে চাই।

এই অসুস্থ শরীরে?

হ্যাঁ, মিঃ হারুন আমার সুস্থ হওয়া পর্যন্ত ওরা সেখানে অপেক্ষা করবে না।

সেই শয়তানের কথা বলছেন।

হাঁ, যারা আমাকে এই এক সপ্তাহ তিলে তিলে শুকিয়ে মেরেছে। মিঃ হারুন আমি আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করতে চাই না। আপনারা আমাকে সাহায্য করলে আমি ওদের আস্তানা খুঁজে বের করতে পারবো।

আনন্দভরা কণ্ঠে বলেন মিঃ হারুন—আমরা আপনাকে সানন্দে সাহায্য করবো, কারণ এটা আমাদেরও ডিউটি।

তাহলে এক্ষুণি পুলিশ ফোর্সকে তৈরি হতে বলুন , আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু মিঃ হারুন, আপনার সঙ্গে গোপনে একটা কথা আছে।

বেশ চলুন।

পাশের কক্ষে গিয়ে দাঁড়ালেন ওরা দু'জন মুখোমুখি। মিঃ রাও বললেন— শয়তানদের পাকড়াও করার পর আমি ডক্টর জয়ন্ত সেনকে গ্রেপ্তার করতে চাই। কারণ, তিনি তাদের সঙ্গে জড়িত আছেন।

মিঃ হারুন বলেন— আমিও অনেক দিন থেকে ঐ রকম সন্দেহ করে আসছি কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে কিছু করতে পারিনি।

আমি হাতেনাতে প্রমাণ পেয়েছি মিঃ হারুন, শুনুন তবে।

বেশ বলুন।

রাও স্ত্রীর ঔষুধ আনবার সময় যে ঘটনা ঘটেছিল এবং যে কারণে ডক্টর সেনকে সন্দেহ করে তিনি তার পেছনে ধাওয়া করেছিলেন— সব খুলে বলেন।

মিঃ হারুন বলেন— ডক্টর সেন শুধু সেই বদমাইশদের সঙ্গেই জড়িত নেই, সে দস্যু বনহুরের সঙ্গেও জড়িত রয়েছে, নইলে এত ডাক্তার থাকতে দস্যু বনহুর আসে তার কাছে।

এসব আলোচনা পরে হবে মিঃ হারুন, আপনি তৈরি হয়ে নিন।

আমি তৈরি হয়েই এসেছি মিঃ রাও চলুন কোথায় যেতে হবে।

তারপর মিঃ হারুন মিঃ হোসেনকে ডেকে পুলিশ ফোর্স নিয়ে দুটি মোটর ভ্যানকে তৈরি হতে বলেন।

কিন্তু যখন শংকর রাও এবং পুলিশ ফোর্স সেই পুরানো বাড়িটায় গিয়ে পৌঁছলেন, তখন সে বাড়ি শূন্য হয়ে গেছে। সারাটা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পাওয়া গেলনা। তবে এটা বুঝা গেল—সকাল হবার পূর্বেও এ বাড়িখানাতে মানুষ ছিল।

প্রত্যেকটা কক্ষে নিপুণভাবে অনুসন্ধান চালালেন মিঃ হারুন। শংকর রাও একটা ছোট্ট কক্ষে প্রবেশ করে বলেন—আজ এক সপ্তাহ আমাকে এই কক্ষে আটক করে রাখা হয়েছিল।

বাড়িটা একেবারে শহরের শেষ প্রান্তে। বাইরে থেকে বাড়িটাকে ঠিক পোড়াবাড়ি বলেই মনে হয়।

বাড়িটাতে যখন নিখুঁতভাবে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে তখন হঠাৎ একটা কক্ষের মেঝেতে একটু ফাঁক দেখা গেল। মিঃ হারুন তখনই পুলিশকে সেখানে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে আদেশ করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা সিঁড়ি বেরিয়ে পড়লো সেখানে।

একটা পাথরের ঢাকনা দিয়ে সিঁড়ির মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মিঃ রাওয়ের চোখে আনন্দের দ্যুতি খেলে গেলো। তিনি ভাবলেন, নিশ্চয়ই সেই পাতালীপুরীর কক্ষে কোন গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে।

মিঃ রাও ও অন্যান্যরা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে চললেন। আশ্চর্য, মাটির তলায় একটা কক্ষ। সিঁড়িটা অবশ্য কক্ষের বাইরে একটা বারান্দাগোছের জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছে। তারপর কক্ষের দরজা।

মিঃ রাও এবং মিঃ হারুন টর্চ জ্বেলে সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন। কক্ষটা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

মিঃ হারুন খুব ভালভাবে লক্ষ্য করে বলেন—মিঃ রাও এ কক্ষেও কাউকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু সে নারী না পুরুষ?

মিঃ রাও তখন টর্চের আলো জ্বেলে খুব ভালো করে দেখছিলেন, হঠাৎ বলে ওঠেন —মিঃ হারুন দেখুন তো এটা কি? ততক্ষণে তিনি জিনিসটা হাতে উঠিয়ে নিয়েছেন। টর্চের আলোতেই দেখলেন একগোছা চুল।

মিঃ হারুন চুলগোছা হাতে নিয়ে বলেন— এ কক্ষে কোন নারী থাকতো। এই দেখুন সে চুল আঁচড়ে খসে পড়া চুলগুলো কুণ্ডলি পাকিয়ে ফেলে দিয়েছে।

তাঁদের অনুমান সত্য। এই কক্ষেই শয়তান নাথুরাম মনিরাকে বন্দী করে রেখেছিল। চুলগোছা তারই মাথার।

এর বেশি আর কিছু পেলেন না মিঃ হারুন এবং মিঃ রাও। শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে তাঁরা ফিরে চললেন। রাগে দুঃখে অধর দংশন করতে লাগলেন শংকর রাও।

পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা জম্বুর বনের একটি গুপ্তগুহায় বন্দী করে রাখা হয়েছে মনিরাকে। সেখানে পিপীলিকাও প্রবেশে সক্ষম নয়। শয়তান নাথুরাম কৌশলে এ গুপ্ত গুহা সৃষ্টি করেছিল। গহন বনের অভ্যন্তরে কঠিন পাথরের তৈরি এই জম্বুর পর্বত।

মনিরা এই নির্জন পর্বতের গুপ্ত গুহায় অবিরত অশ্রু বিসর্জন করে চলেছে। তার মন থেকে মুছে গেছে আশার স্বপ্ন, ধূলিসাৎ হয়ে গেছে সমস্ত বাসনা। আর কোনদিন সে লোকালয়ে ফিরে যেতে পারবে, তা কল্পনাও করতে পারে না।

আজ প্রায় দু'সপ্তাহ হতে চললো তাকে চুরি করে এনেছে তারা। সেই রাতের কথা মনে হলে আজও শিউরে ওঠে মনিরা। নিশীথ রাতে নিদ্রাহীন মনিরা অস্থিরচিত্তে কক্ষে পায়চারী করছিল—বনহুরের চিন্তায় সে আচ্ছন্ন ছিল—এমন সময় দরজায় মৃদু টোকা পড়লো— দরজা খুলে বেরিয়ে আসে সে দু'জন বলিষ্ঠ লোক তার নাকের ওপর একখানা রুমাল চেপে ধরে—তারপর এই নির্মম পরিণতি। যদিও আজ পর্যন্ত মুরাদ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি, নাথুরাম এবং তার অনুচরগণও মনিরার দেহে হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হয়নি, তবু সে যদি এখন কোনক্রমে মামা মামীর পাশে ফিরে যেতে পারে তাহলে কি তাঁরা আগের মত স্বচ্ছমনে গ্রহণ করবেন? তাকে তাঁরা স্নেহ করেন, মমতা করেন, ভালবাসেন হয়তো তাঁদের মনে বাধবে না, কিন্তু সমাজ—সমাজ কি তাকে আশ্রয় দেবে? কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, তাতে কিছু আসে যায় না। মনির—তার মনির যদি তাকে বিশ্বাস না করে? হঠাৎ মনিরার চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গুহায় মুখ ধীরে ধীরে এক পাশে সরে যায়, গুহায় প্রবেশ করে মুরাদ।

মনিরার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। হৃদকম্প শুরু হয় তার। বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে মুখমণ্ডল। সামনে আজরাইলকে দেখলেও বুঝি এতখানি ভয় পেতো না মনিরা।

মুরাদের চোখমুখ আজ তার কাছে অতি ভয়ংকর মনে হয়। চোখ দুটো রক্ত জবার মত লাল টকটকে। টলতে টলতে প্রবেশ করলো সে। মনিরাকে দেখতে পেয়ে জড়িতকণ্ঠে সাদর সম্ভাষণ জানাল মুরাদ—গুড নাইট মিস মনিরা!

মনিরা কোন জবাব দিল না, সঙ্কুচিতভাবে গুহার এক কোণায় গিয়ে দাঁড়াল।

মুরাদ হেসে বলল—এখনও তোমার লজ্জা গেল না প্রিয়ে? মনিরা এখানে তো তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না?

এমন সময় নাথুরাম একটুকরা কাগজ ও কলম নিয়ে গুহায় প্রবেশ করলো।—হুজুর, এ

নিন।

মুরাদ ফিরে তাকালো নাথুরামের দিকে, তারপর বলল—

এসো।

মনিরা জড়োসড়ো হয়ে আছে। অন্তরের ভয়ার্ত ভাব তার মুখে সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। মনিরা রাগে ক্ষোভে ভয়ে কেমন যেন হয়ে পড়েছে।

মুরাদ এবার এগিয়ে যায় তার দিকে—এসো, এই নাও কলম, ও যা বলবে লিখে দাও চট্‌ চট্‌। তারপর নাথুরামকে লক্ষ্য করে বলে—বল নাথু?

নাথুরাম কর্কশকণ্ঠে বলল—কি আর এমন লিখতে হবে। কথার ফাঁকে পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে এগিয়ে দেয় মুরাদের দিকে—শুধু এই কথাগুলো লিখলেই চলবে।

মুরাদ নাথুরামের হাত থেকে সেই কাগজের টুকরাখানা নিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরলো। পড়া শেষ করে হেসে বললো তোমার বুদ্ধি শিয়ালের চেয়েও বেশি নাথু।

সাধে কি আর আপনার মত লোক আমাকে টাকা দেয় হুজুর।

দিন চট করে ওটা লিখে দিন আমাকে। এখনই পাঠাতে হবে। ভোর হবার আগেই যেন ওটা পুলিশ অফিসে গিয়ে পৌঁছে।

তুমি যা ভেবেছিলে তাই হলো। ঘুঘুটাকে ফাঁদ থেকে বের করাই ভুল হয়েছিল। তাই সে বেঁচে গেল।

নাথুরামের চোখ দুটো ধক করে জ্বলে ওঠে। দাঁতে দাঁত পিষে বলে—ঘুঘুটার কোন দোষ নেই হুজুর। ওকে আমি যেভাবে পিছমোড়া করে বেঁধে গাড়ির পেছনে মেঝেতে শুইয়ে রেখেছিলাম কোন ব্যাটাই ধরতে পারতো না। যদি ঐ পাজিটা আমার গাড়িখানাকে ফলো না করত।

সে কে তাকে তুমি চিনতে পেরেছিলে নাথুরাম?

তাকে চিনতে না পারলেও অনুমানে বুঝতে পেরেছি সে দস্যু বনহুর ছাড়া আর কেউ নয়।

আমারও তাই মনে হয় নাথু, নাহলে তোমার মত বলবান বীর পুরুষকে কাবু করতে পারে, এমন লোক আছে?

মনিরার হৃদয়ে এক অনাবিল শান্তির প্রলেপ ছোঁয়া দিয়ে যায়। মনির তাহলে মিঃ রাওকে উদ্ধার করে নিতে পেরেছে। সে তাহলে নীরব নেই। তাকেই খুঁজে ফিরছে সে। হয়তো তার কথা স্মরণ করে চোখের পানি ফেলছে। মনির ভাবছে মনিরার কথা—এ যে মনিরার কত বড় সৌভাগ্য মনির—তার মনির না জানি এখন কোথায় কি করছে। মনিরা নিজের জন্য দুঃখ করে না। যত ভাবনা ওর জন্য। তাকে খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ কোন বিপদে না পড়ে। খোদা, তুমি ওকে বাঁচিয়ে নিও।

নাথুরামের কথায় মনিরার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে। নাথুরাম বলছে—মিস মনিরা দাও ওটা লিখে দাও।

মুরাদ কাগজ দু'খানা আর কলমটা মনিরার হাতে গুঁজে দিল।—এ কথাগুলো ঐ সাদা কাগজখানায় লিখে দাও।

মনিরা কাগজখানায় দৃষ্টি বুলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়—না আমি কিছুতেই একথা লিখবো না।

মুহূর্তে মুরাদ গর্জে ওঠে—কি বললে, তুমি লিখবে না?

না!

দাঁতে দাঁত পিষে বলে মুরাদ—তোমাকে লিখতে হবে।

কখ্খনো না।

মুরাদ এবার নাথুরামের দিকে তাকালো। নাথুরাম, আমি আদেশ দিলাম। তুমি যেমন করে পারো ওর কাছ থেকে লিখিয়ে নাও।

হুজুর, আপনি একটু বাইরে যান।

বেশ, আমি যাচ্ছি। মুরাদ গুহার দরজার দিকে পা বাড়ায়।

মনিরার বুক থর থর করে কেঁপে ওঠে। শিউরে ওঠে তার শরীর। মুরাদের চেয়েও মনিরা নাথুরামকে বেশি ভয় করে। মুরাদ বেরিয়ে গেলে নাথুরাম কি করে বসবে ভাবতে পারে না মনিরা।

দু'হাতে মাথার চুল টানতে থাকে মনিরা। নাথুরাম তার ভয়ংকর বীভৎস বড় বড় চোখ মেলে চায় তার দিকে। লিখবে না তুমি? বেশ! নাথুরাম এগুতে থাকে। মনিরা নাথুরামের ভয়ংকর ভয়ানক মুখখানার দিকে তাকিয়ে ভীতভাবে কাগজ দু'খানা হাতে তুলে নেয়।

কলমটা ছিটকে দূরে পড়ে গিয়েছিল, ওটা মনিরার হাতে তুলে দেয় নাথুরাম। লক্ষ্মী মেয়ের মত চট করে লিখে ফেলো।

মনিরা কাগজ নিয়ে লিখতে বসে। লেখা শেষ করে উঠে দাঁড়ায়।

নাথুরাম ডাকে—হুজুর, এবার ভেতরে আসুন।

মুরাদ হাসতে হাসতে গুহায় প্রবেশ করে—হয়েছে?

হ্যাঁ, এই দেখুন। মনিরার লিখিত কাগজখানা নাথুরাম মুরাদের কাছে দেয়।

মুরাদ কাগজখানা পড়ে বলে—চমৎকার! নাথু, তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারি না।

নাথুরাম মুরাদের হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে বলে—এবার আপনি নিশ্চিন্ত হুজুর। এই চিঠি পেলে পুলিশ আর মনিরার সন্ধান নিয়ে উঠে পড়ে লাগবে না, ওর মামা মামী নিশ্চিন্তে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। আমি তাহলে....

মুরাদ জড়িতকণ্ঠে হাই তুলে বলে—এসো।

মনিরা ক্ষিপ্তের ন্যায় বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে মুরাদের দিকে। সে যদি মুনি ঋষি হতো তাহলে তার দৃষ্টিশক্তি দিয়ে ভস্ম করে দিত মুরাদকে।

মুরাদ মনিরার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। মনিরার দৃষ্টি তার শরীরে যেন তীর ফলকের মত গিয়ে বিঁধছে। গাটা যেন শির শির করে ওঠে তার। মনিরার একি মূর্তি? মুরাদ কেমন যেন চমকে যায়। মদের নেশা ছুটে যায়। মনিরার নিঃশ্বাস যেন তার সমস্ত দেহে আগুন ধরিয়ে দেয়।

মুরাদ যেন আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে পারে না। অসহ্য লাগছে ওকে। কি হলো — হঠাৎ এমন বিশ্রী লাগছে কেন? আর স্থির থাকতে পারে না মুরাদ, ধীরে ধীরে সরে পড়ে।

মুরাদ বেরিয়ে যেতেই বিরাট পাথরের দরজাখানা গুহার মুখ বন্ধ করে ফেলে। হঠাৎ মুরাদের ভয় বা ভীতির কোন কারণ ছিল না, আসলে আজ তার মদের মাত্রা খুব বেশি হয়েছিল।

মুরাদ চলে যেতেই মনিরা লুটিয়ে পড়লো মেঝেতে। কাঁদতে লাগলো ছোট্ট বালিকার মত। মাথার চুল টেনে ছিঁড়ল। ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করলো তবু তার কান্নার বিরাম নেই।

কেঁদে কেঁদে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো মনিরা। স্বপ্ন দেখছে সে, মনিরা কাঁদছে—কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। আর কত কাঁদবে সে! হঠাৎ গুহার দরজা খুলে যায়। মনিরা চমকে উঠে বসলো। একি! গুহার দরজায় মনির দাঁড়িয়ে। তার চোখে মুখে ব্যাকুলতার ছাপ। মলিন বিষণ্ন মুখমণ্ডল—ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক। তাকে দেখতে পেয়ে ওর চোখ দুটো খুশিতে দীপ্ত হয়ে ওঠে। অস্ফুট কণ্ঠে ডেকে ওঠে সে—মনিরা তুমি এখানে। আর আমি তোমাকে গোটা পৃথিবী খুঁজে বেড়াচ্ছি। মনিরাও ওকে দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লো। উচ্ছলকণ্ঠে বললো—মনির তুমি এসেছো। ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে ওর বুকে। হঠাৎ মাটি আঁকড়ে চিৎকার করে ওঠে— মনির — মনির! ঘুম ভেঙে যায় মনিরার—তাকিয়ে দেখে কেউ নেই—কিছু নেই-শূন্য গুহার মেঝেতে সে একা শুয়ে আছে।

হতাশ হয়ে শয্যায় শুয়ে পড়লো বনহুর। আজ কতদিন তার এতটুকু বিশ্রাম হয় নি। অহরহ মনিরার সন্ধানে সে উল্কার মত ছুটে বেড়িয়েছে। আহার নিদ্রা একেবারে পরিহার করেছে সে। নূরী জোর করে চারটি খাইয়ে দেয়, তাই সে বেঁচে আছে।

শুধু বনহুরই নয়, তার অনুচরগণও এতদিনে বিশ্রাম নেবার সুযোগ পায় নি। কেউ হোটেলের বয়ের কাজ নিয়েছে, কেউ বা ধোপা, কেউ নাপিত —যে যেভাবে পারে মনিরার অনুসন্ধান করে চলছে।

যদিও সকলের মনে ঐ একটি প্রশ্ন, চৌধুরীকন্যার জন্য দস্যু বনহুরের এত মাথাব্যথা কেন, তবু কেউ প্রকাশ্যে কিছু বলতে বা জিজ্ঞাসা করতে সাহসী হয় না। একদিকে ভয় অন্যদিকে লাখ টাকা পুরস্কারের লোভ দস্যু বনহুরের অনুচরগণকে উন্মত্ত করে তুলেছে। সবাই আপ্রাণ চেষ্টায় চৌধুরীকন্যাকে খুঁজে চলেছে।

এমন দিনে বনহুরের কয়েকজন অনুচর একটি যুবতীকে কোন লম্পট গুণ্ডাদলের কবল থেকে উদ্ধার করে এনে হাজির করলো তাদের আস্তানায়।

অনুচর ক'জনের আনন্দ আর ধরে না। সর্দার আজ খুশি হয়ে তাদের আশাতিরিক্ত পুরস্কার দেবেন।

কথাটা প্রথম নূরীর কানে যায়। মনিরাকে পাওয়া গেছে জেনে সেই প্রথম ছুটে আসে বনহুরকে কিছু না জানিয়ে। কারণ মনিরার জন্য দস্যু বনহুরের মত লোক আজ কতদিন হলো উন্মাদের মত হয়ে পড়েছে। যদিও বনহুর মনিরার সম্বন্ধে নূরীর নিকট কিছু বলেনি তবু নূরী বেশ বুঝতে পারে বনহুর সেই মনিরার জন্য কত চিন্তিত।

নূরী বনহুরের মনিরাকে আগে দেখে নেবে।

নূরী ছুটে গেল আস্তানার বাইরে যেখানে বনহুরের অনুচরগণ মেয়েটিকে এনে জটলা পাকাচ্ছে।

নূরী আসতেই সবাই সরে দাঁড়ালো।

নূরী এগিয়ে গেল মেয়েটির পাশে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে মেয়েটিকে দেখতে লাগলো। যুবতীর বয়স সতের কি আঠারো হবে। ছিপছিপে মাঝারি গড়ন। গায়ের রং শ্যামলা চেহারা বিশ্রী। নাকটা চ্যাপ্টা। নূরী ওকে দেখে হাসলো —এই যার রূপের ছিরি, তাকেই কিনা খুঁজে মরছে হাজার হাজার লোক। নূরী জিজ্ঞাসা করলো— এই, তোমার নাম?

মেয়েটা নূরীকে দেখে একটু আশ্বস্ত হয়েছিল। নইলে এই লোকগুলোর কার্যকলাপ তার কাছে মোটেই ভাল লাগছিল না। নূরীকে কথা বলতে দেখে খুশি হল, বলল—আমার নাম মনি।

নূরী ওর নাম শুনে ভাবলো, এই বুঝি সেই চৌধুরীকন্যা মনিরা, ওকে বুঝি সবাই মনি বলে ডাকে। নূরীর মায়া হলো ভাবলো অযথা বনহুরকে সে সন্দেহ করে চলেছে। এমন চেহারার কোন মেয়েকে কোন পুরুষ ভালবাসতে পারে? বনহুর লোকের কষ্ট ব্যথা সহ্য করতে পারে না,তাই বুঝি এমন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

নূরী মেয়েটার খাওয়া এবং বিশ্রামের আয়োজন করে চলে গেল বনহুরের কাছে।

বনহুর তখন বিছানায় চিৎ হয়ে আকাশ পাতাল কত কি ভাবছে এমন সময় নূরী গিয়ে বসলো তার সামনে। আজ নূরীর মুখ হাস্যোজ্জ্বল। আজ ক'দিন নূরী বনহুরের সামনে আসে, পাশে বসে কথা বলে কিন্তু ঠিক আগের মত স্বচ্ছমনে কথা বলতে পারে না। তেমনি করে আগের

ধরে রাখতে পারে না। বনহুর তার পাশে রয়েছে তবু মনে হয় অনেক দূরে-নূরীর ধরাছোঁয়ার বাইরে।

আজ নূরীর মন থেকে একটা কালো মেঘ যেন কেটে গেছে। মনিরা সম্বন্ধে তার যে একটা ধারণা ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। হেসে বলল নূরী—হুর, তোমার মনিকে পাওয়া গেছে।

মনি? মনিরাকে পাওয়া গেছে!

হ্যাঁ, তাকে আমাদের আস্তানাতেই আনা হয়েছে। এখন সে বিশ্রাম কক্ষে বিশ্রাম করছে।

বনহুর নূরীর কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হলো—দু'হাতে নূরীকে এঁটে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো সত্যি? সত্যি বলছ নূরী?

হ্যাঁ হ্যাঁ যাও, ওকে দেখে এসো।

বনহুর লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর ছুটলো আস্তানার দিকে।

বনহুরকে দেখেই কয়েকজন অনুচর আনন্দ ভরা কণ্ঠে বললো সর্দার চৌধুরীকন্যাকে আমরা উদ্ধার করে এনেছি।

বনহুর বলে ওঠে—কোথায় সে?

মেয়েদের বিশ্রামাগারে বিশ্রাম করছে।

বনহুর আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে বিশ্রামাগারের খোজা পাহারাদারকে ডেকে বললো—যাকে এইমাত্র উদ্ধার করে আনা হয়েছে, তাকে পাঠিয়ে দাও।

খোজা পাহারাদার চলে গেল।

বনহুর বাইরে পায়চারী শুরু করলো। অন্য কোন ব্যাপারে হলে দরবারকক্ষে বসে তাকে সেখানে ডেকে পাঠাতো সে। কিন্তু এ যে মনিরা —তার হৃদয়ের রাণী।

পদশব্দে ফিরে তাকালো বনহুর খোজা পাহারাদারের পেছনে ঘোমটা টানা একটা নারী।

বনহুরের চোখে মুখে একরাশ বিস্ময় ফুটে উঠল। সে দ্রুত হস্তে একটানে যুবতীর ঘোমটা সরিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখমণ্ডল গম্ভীর বিষণ্ন হলো। এই কি তার মনিরা। রাগে ক্ষোভে অধর দংশন করতে লাগলো। মেয়েটি বনহুরকে দেখে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বনহুর দক্ষিণ হাতে নিজের মাথার চুল টেনে ধরলো তারপর ডাকালো রহমান, রহমান।

অনুচরদের মধ্য থেকে একজন বললো—রহমান ভাই এখনও ফেরেনি সর্দার।

বনহুর তাকেই ডাকলো—মংলু।

জী সর্দার।

একে জিজ্ঞাসা করো—কোথায় এর বাপ মা, আত্মীয় স্বজন পৌঁছে দিয়ে এসো সেখানে। কোন অসুবিধা যেন না হয় ওর।

আচ্ছা সর্দার।

বনহুর ততক্ষণে নিজের কক্ষের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে।

নূরী মেয়েটাকে পূর্বেই দেখেছে। একটা অবজ্ঞা ভাব ফুটে উঠেছে তার মনে। কতকটা আশ্বস্ত হয়েছে। তার হুরকে নিয়ে আর কোন চিন্তার কারণ নেই। কাজেই সে আর বনহুরকে অনুসরণ না করে সেই কক্ষেই বসে ছিল।

বনহুরকে অল্পক্ষণের মধ্যেই গম্ভীর মুখে ফিরে আসতে দেখে নূরী হেসে বলে—মনিকে পেয়েছ?

বনহুর ধপ করে শয্যায় বসে পড়ে বলে—হ্যাঁ।

কোথায় সে?

পাঠিয়ে দিয়েছি।

তার বাপ মার কাছে বুঝি?

হ্যাঁ।

কই, তোমার মনিরাকে পেয়েও তোমার মুখে হাসি ফুটলো না আশ্চর্য। এসো ঝর্ণার ধারে যাই। নূরী বনহুরের দক্ষিণ হাত ধরে টেনে তোলে।

ঝর্ণার ধারে গিয়ে পাশাপাশি বসে ওরা।

নূরী বলে—দেখ হুর, কত সুন্দর স্বচ্ছ জলধারা। আমার মনে হচ্ছে, অনেকগুলো মেয়ে যেন একসঙ্গে হাসছে।

না, কাঁদছে। কথাটা গম্ভীর ভাবাপন্ন কণ্ঠে বলে বনহুর।

ছিঃ তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ। এসো, আমার কোলে মাথা রেখে শোও। দেখ হুর কি সুন্দর নীল আকাশ। ঐ যেন শুভ্র বলাকাগুলো ডানা মেলে উড়ে চলেছে—তোমার কি মনে হয় না আমরাও অমনি করে ডানা মেলে উড়ে যাই?

উহুঁ জানতো আমি দস্যু।

হলেই বা।

দস্যুর মনে কি কাব্যের রঙ লাগে? ওসব তোমাদের চোখে ভাল লাগে।

নূরী বনহুরের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে, তারপর গুণ গুণ করে গান ধরে।

বনহুর নীরবে তাকিয়ে থাকে পশ্চিম আকাশে অস্তাচলগামী সূর্যের ক্ষীণ রশ্মির দিকে—ভাবে, তার মনিরার জীবন সূর্যও বুঝি এমনি করে নিঃশেষ হয়ে আসছে।

মনিরার কথা মনে পড়তেই বনহুর সোজা হয়ে বসে। এখন তার বসে থাকার সময় নয়। চঞ্চল হয়ে ওঠে বনহুর।

নূরী উঠে বসে দু'হাতে বনহুরের গলা বেষ্টন করে বলে—ভাল লাগছে না তোমার?

বনহুর কোন জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

নূরী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। অভিমানে ভরে ওঠে তার মন, বনহুর ততক্ষণে সামনের দিকে পা বাড়িয়েছে।

নিজের কক্ষে প্রবেশ করে পায়চারি করতে থাকে বনহুর। এমন সময় রহমান দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়—সর্দার, আমি এসেছি।

ভেতরে এসো। গম্ভীর গলায় বলে বনহুর।

রহমান ছিন্নভিন্ন মলিন বসন পরিহিত অবস্থায় ভেতরে প্রবেশ করে —সর্দার।

বল?

আজ আমি ভিখারীর বেশে বেরিয়েছিলাম।

কোন সন্ধান পেয়েছ?

পেয়েছি, কিন্তু তাতে কোনো উপকার হবে কিনা জানি না।

বনহুর খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে প্রশ্ন ভরা ব্যাকুল আঁখি মেলে তাকায় রহমানের মুখের দিকে।

রহমান বলে—সর্দার আমি আজ ভিখারীর বেশে পুলিশ অফিসের পিছনে গিয়ে বসেছিলাম। আমাকে কেউ দেখতে পায়নি। অফিসের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। আমি যা শুনতে পেলাম, তার সারাংশ হচ্ছে এই—একটা পোড়াবাড়ির সন্ধান নাকি তারা পেয়েছিল। সে বাড়ির একটা গোপন কক্ষে চৌধুরী কন্যাকে আটক করে রাখা হয়েছিল। এখন সেখানে-মানে সেই বাড়ি শূন্য পড়ে রয়েছে, সেখানে কাউকে তারা পায়নি।

এটুকু শুধু শুনেছিলে?

হ্যাঁ সর্দার, পুলিশ অফিসের বাইরে থেকে শুধু ভাঙা ভাঙাভাবে এইটুকু আমার কানে এসেছিল।

বেশ, তুমি এখন যাও, বিশ্রাম করোগে।

রহমান বেরিয়ে যায়।

বনহুর মুক্ত জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু চিন্তা করে। হঠাৎ তার মুখোভাব বেশ স্বচ্ছ হয়ে আসে। আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করে।

জম্বুর বনের পথে ছোট্ট পাহাড়টির পাদমূলে একটি টিলার পাশে জটাজুটধারী জপমালা বাঘের চামড়া পরিহিত একজন সন্ন্যাসীর আর্বিভাব হয়েছে। চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত। ললাটে চন্দনের তিলক। দক্ষিণ হাতে আশা। মুখে চাপদাঁড়ি। বিড়বিড় করে মন্ত্র জপ করছে।

সে অঞ্চলের সকলেই সন্ন্যাসীর আবির্ভাবে মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়েছে। নিশ্চয়ই এ সন্ন্যাসী মহাদেব শিবশঙ্করের কোন ভক্ত বা শিষ্য। কারণ সন্ন্যাসীর চেহারা অতীব প্রশান্তিময় পবিত্রময় প্রশস্ত ললাট উন্নত নাসিকা বিশাল বক্ষ উজ্জ্বল দীপ্ত মুখমণ্ডল। সবাই এই দেবসমতুল্য সন্ন্যাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলো। কেউ বা ফলমূল নিয়ে হাজির হলো তার সামনে, কেউ বা ফুল নিয়ে গেল তার পূজার জন্য।

নানা জন নানা মনোবাসনা নিয়ে সন্ন্যাসীর চরণযুগল আঁকড়ে ধরলো। কেউ সন্তান আশায়, কেউ বা মামলা মোকদ্দমার জন্য, কেউ ভালবাসা কামনায়। সন্ন্যাসীর সামনে ভক্তের দল জটলা পাকাতে লাগল।

কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই শুনল এই সন্ন্যাসীর কথা।

একদিন মুরাদের কানেও পৌঁছল সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা। এ কথাও সে জানতে পারল— সন্ন্যাসী বাবাজীর আশীর্বাদে সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

মুরাদ চিন্তা করলো–আজও সে মনিরাকে বশীভূত করতে পারল না। তার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হতে চলেছে। মনিরাকে জোরপূর্বক সে আটকে রাখতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ মনিরা তাকে মনেপ্রাণে ভাল না বাসছে, ততক্ষণ তার এ আটকে রাখায় কোন সাফল্য নেই।

একদিন রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন করে মুরাদ সন্ন্যাসী বাবাজীর নিকটে গেল। তখন সন্ন্যাসী একা ছিলেন। কোনো লোকজন ছিল না তাঁর পাশে। এদিক-সেদিক তাকিয়ে মুরাদ লুটিয়ে পড়ল সন্ন্যাসীর পায়ে। ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলল—বাবাজী বাবাজী, আমার প্রতি সদয় হোন, আমার প্রতি সদয় হোন। আমি বড় দুঃখী.....

বারবার অনুনয় বিনয় করায় ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন সন্ন্যাসী বাবাজী। শান্ত-সুস্থির গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—বৎসে, আমি জানি তুমি কি চাও। কিন্তু যা চাও, তা পাবার নয়! সন্ন্যাসী বাবাজী নীরব হলেন।

মুরাদ অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে বলে ওঠে—বাবাজী, তাহলে উপায়? বলুন, বলুন, আমি কি করে তার মন পাব?

সন্ন্যাসী আবার নিশ্চুপ।

গভীর রাতের অন্ধকারে মাটির প্রদীপের ক্ষীণালোক সন্ন্যাসী বাবাজীকে পাথরের মূর্তির মত স্থির মনে হচ্ছে। আশে পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ।

মৃদুমন্দ বাতাসে গাছের পাতাগুলো টুপটাপ করে খসে পড়ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে শেয়ালের ডাক। মেঘশূন্য স্বচ্ছ আকাশ। অসংখ্য তারা জ্বলছে সেখানে। সন্ন্যাসী চোখ মেলে

আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন—মেয়েটার নাম উচ্চারণ কর। নিঃশ্বাস বন্ধ করে নাম উচ্চারণ করবে। একবার, দু'বার, তিনবার। খবরদার! ততক্ষণ নিঃশ্বাস নেবে না।

মুরাদ নিঃশ্বাস বন্ধ করে তিনবার উচ্চারণ করলো—মনিরা...... মনিরা—মনিরা.....

ব্যাস! আবার চোখ বন্ধ করলেন সন্ন্যাসী বাবাজী। কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়ালেন। তারপর গম্ভীর গলায় বলেন— বৎস! কন্যার নামের সঙ্গে তোমার নামের মিল রয়েছে। মুরাদ আর মনিরা।

সন্ন্যাসীর মুখে নিজ নাম শুনে অত্যধিক বিস্মিত হলো মুরাদ। সে তো তাঁকে নিজের নাম বলেনি। ভক্তিতে নুয়ে পড়লো মুরাদ।

সন্ন্যাসী আবার জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি তাকে স্পর্শ করেছ?

না, সে মেয়ে নয় যেন কালনাগিনী। তার নিকটে গেলে আমি তার চোখের দিকে চাইতে পারি না। মনে হয় ওর নিঃশ্বাসে আগুন ঝরছে। সে আগুনে আমি জ্বলেপুড়ে ছাই হবার জোগাড় হই।

বেশ।

মুরাদ অভিমানভরা কণ্ঠে বলে—এটা বেশ! আমি তাকে ভালবাসি আর সে আমাকে বিষচোখে দেখে–এটা বেশ?

বৎস! ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। তাকে তুমি পাবে। অতি নিজের করে পাবে, কিন্তু সে যাকে ভালবাসে তাকে ওর মন থেকে মুছে ফেলতে হবে।

এ কথা আমিও ভেবেছি, কিন্তু তার কোন উপায় নেই। বাবাজী, মনিরা যাকে ভালবাসে—সে দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ, আমি গণনায় তারই নাম খুঁজে পেয়েছি।

বাবাজী, ঐ দস্যু বনহুরকে নিপাত করা যায় না? ওকে নিহত করতে পারলে মনিরা আমার হবে।

হাঁ, সে কথা আমিও ভাবছি। কিন্তু বনহুরকে নিপাত করতে হলে চাই সাধনা। তাহলে তুমি অসীম শক্তি লাভ করবে।

কি সাধনা করতে হবে বাবাজী?

সব পরে বলব। তুমি কিছু ভেবো না। আজ যাও, আবার কাল গভীর রাতে এমন সময় এখানে আসবে। মনিরাকে সঙ্গে এনো, ওর বস্ত্রাঞ্চলের ওপর বসে তোমাকে ধ্যান-সাধনা করতে হবে।

বাবাজী, আমি আপনাকে অজস্র অর্থ দেবো।

সন্ন্যাসী কোনদিন অর্থলোভী হয় না। যাও আর বিলম্ব করো না, আমার ধ্যানের ব্যাঘাত হচ্ছে।

মুরাদ সন্ন্যাসী বাবাজীর চরণধূলি মাথায় নিয়ে ধীরে ধীরে চলে যায়।

পরদিন আবার আসে মুরাদ।

গোটা পৃথিবী সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। আকাশ আজ স্বচ্ছ নয়। সন্ধ্যার পর থেকে ঝুপঝাপ বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, দমকা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। শীতের রাত–তদুপরি দুর্যোগময় মুহূর্ত। নির্মেল হাওয়া মানুষের হাড়ে হাড়ে কাঁপন লাগায়। জন প্রাণী শূন্য পথ বেয়ে মুরাদ এসে দাঁড়াল সন্ন্যাসী বাবাজীর সামনে। বিনীত কণ্ঠে ডাকলো—বাবাজী।

সন্ন্যাসী বাবাজীর শরীর সিক্ত হয়ে উঠেছে। জটা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা পানি। বিদ্যুতের আলোতে সন্ন্যাসীকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। সংসারত্যাগী মানুষ, তার আবার শীত-তাপ কিছু আছে। চোখ বন্ধ করে কি যেন মন্ত্র জপ করছেন। মুরাদের কণ্ঠস্বরে চোখ মেলে তাকালেন সন্ন্যাসী বাবাজী। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলেন — সঙ্গিনী কই?

মুরাদ হাতজোড় করে কম্পিত গলায় বলল—বাবাজী, তাকে আনতে পারলাম না। সহজে নড়বে তবু সে নড়বে না। জোরপূর্বক আনা যায় বাবাজী, আপনি যদি বলেন, তাকে লোক দিয়ে পাকড়াও করে আনতে পারি।

দরকার নেই।

তাহলে আমার সাধনা হবে না!

হবে বৎস, তোমার দুঃখ আমার হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। তুমি যাকে চাও সে তোমাকে চায় না-বড় দুঃখ।

তাহলে কি করব?

আমি যাব সেখানে।

আনন্দে অস্ফুটধ্বনি করে ওঠে মুরাদ—বাবাজী!

হ্যাঁ, আমি যাবো। কিন্তু জানো বৎস, আমি লোকের সামনে যাই না।

আমি আপনাকে অতি গোপনে সেখানে নিয়ে যাব। বাবাজী, কি বলে যে আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো।

দরকার নেই।

চলুন তাহলে বাবাজী?

চলো।

এক হাতে আশা, আর এক হাতে রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী বাবাজী।

আগে চলল মুরাদ, পেছনে চললেন সন্ন্যাসী বাবাজী।

গহন বনের মাঝ দিয়ে পাহাড় আর টিলার পাশ কেটে এগিয়ে চলেছে মুরাদ আর সন্ন্যাসী বাবাজী। বৃষ্টি থেমে এসেছে, কিন্তু মেঘের ডাক আর বিদ্যুতের চমকানী এখনও থেমে যায়নি।

মুরাদের হাতে ছিল একটা টর্চ, তারই আলোতে পথ দেখে এগুচ্ছিল তারা।

প্রায় ঘণ্টা দুই চলার পর জম্বুর পর্বতের পাদমূলে গিয়ে পৌঁছল মুরাদ আর সন্ন্যাসী বাবাজী।

ঝোপঝাড় আর জঙ্গলে ঘেরা জম্বুর পর্বতের গা ঘেঁষে কিছুটা এগুলো। এই পথটুকু চলতে তাদের কষ্ট হচ্ছিল। আরও কিছুটা এগুনোর পর মুরাদ একস্থানে দাঁড়িয়ে একবার, দু'বার, তিনবার শিস্ দিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ হলো। দেখা গেল পর্বতের পাদমূল ধীরে ধীরে একপাশে সরে যাচ্ছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে সুন্দর একটা সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে এলো. দু'জন মশালধারী ভীমাকার লোক সুড়ঙ্গমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

মুরাদকে দেখে তারা সরে দাঁড়ালো, সন্ন্যাসী বাবাজীকে নিয়ে মুরাদ অতি সন্তর্পণে গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। একটি নয়, দুটি নয়—প্রায় সাতটি গুহার মুখ পেরিয়ে মুরাদ সন্ন্যাসী বাবাজীকে নিয়ে একটি পাথরখণ্ডের নিকট দাঁড়ালো। তারপর পাশে একটি যন্ত্রে হাত রাখতেই পাথর হড়হড় শব্দে একপাশে সরে গেল।

সন্ন্যাসী বাবাজী আর মুরাদ সেই গুহায় প্রবেশ করলো। গুহার মধ্যে এককোণে একটি মশাল জ্বলছিল। এক পাশে একটি মজির খাট। খাটে শুয়ে ছিল এক যুবতী।

মুরাদ আর সন্ন্যাসী বাবাজীর পদশব্দে মুখ তুলে তাকালো যুবতী। মুরাদের সাথে জটাজুটধারী সন্ন্যাসী দেখে সে চমকে উঠলো। ভয়ে পাংশু হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল। আলুথালু বেশে উঠে দাঁড়ালো।

মুরাদ সন্ন্যাসী বাবাজীকে লক্ষ্য করে বললো—এই সেই মনিরা।

সন্ন্যাসী বাবাজী অস্ফুটস্বরে বলেন—ও।

মুরাদ ভক্তিভরে মাথা নত করে বললো—বাবাজী, সব আমি আপনাকে বলেছি, আর নতুন করে আর বলতে হবে না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মনিরার দিকে তাকালেন সন্ন্যাসী বাবাজী। তারপর বলেন—তুমি বাইরে যাও, তোমায় যখন ডাকবো তখন ভেতরে এসো-সাধনা শুরু হবে।

মুরাদ খুশিমনে বেরিয়ে গেল।

সন্ন্যাসী মনিরার দিকে এগুলেন। মশালের আলোতে নিপুণ দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলেন। তারপর বলেন-এসো, তোমার মাথায় ফুঁ দিই।

না দৃঢ় কণ্ঠস্বর মনিরার।

যুবতী, তোমাকে সে চায়—কেন ওকে তুমি পায়ে ঠেলছো?

রুদ্ধকণ্ঠে বলে মনিরা—ওকে আমি চাই না। প্রাণ যদি যায় তবুও না!

কিন্তু আমি এমন মন্ত্র পাঠ করে তোমায় ফুঁ দেবো তখন দেখবে সে-ই তোমার প্রিয়জন হয়ে দাঁড়াবে।

মনিরা আকুলভাবে কেঁদে উঠলো-না না সন্ন্যাসী, আপনি আমার সর্বনাশ করবেন না। তার চেয়ে আমাকে হত্যা করুন।

তা হয় না। সে আমাকে অনেক অনুনয় বিনয় করে তবেই এখানে এনেছে। আমি তাকে ফাঁকি দিতে পারি না।

আপনি সংসারত্যাগী মহাপুরুষ, আপনি একজন মহান ব্যক্তি, একটি নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সর্বনাশ করতে পারবেন? আপনার হৃদয় কি এতটুকু কাঁপবে না?

যুবতী, আমি সকলেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তুমি কি চাও-বলতে পার?

মনিরা যেন অন্ধকারে আলোর সন্ধান পায়। ব্যাকুলকণ্ঠে বলে-আপনি আমাকে বাঁচান.....

সন্ন্যাসী গম্ভীরকণ্ঠে বলেন-বুঝেছি, তুমি একজনকে ভালবাস।

হ্যাঁ বাসি।

কে সে?

না না, তা বলতে পারি না।

পারতে হবে। আমি তাহলে তোমাকে তার নিকট পৌঁছে দেব।

সত্যি?

হ্যাঁ, বল তার নাম কি? অবশ্য তুমি না বললেও আমি যোগবলে জানতে পেরেছি। যাকে তুমি ভালবাস-সে দস্যু বনহুর।

মনিরা অস্ফুটধ্বনি করে ওঠে-সন্ন্যাসী, আপনি সবই জানেন। আমাকে এই লম্পট শয়তানের হাত থেকে বাঁচান-বাঁচান-আকুলভাবে কেঁদে ওঠে মনিরা।

সন্ন্যাসী মনিরার মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনার সুরে বলেন-ক্ষান্ত হও। যদি আমাকে বিশ্বাস করো তবে তোমাকে তোমার প্রিয়ের নিকট পৌঁছে দিতে পারি।

সত্যি?

হ্যাঁ, তুমি মুরাদের সঙ্গে আমার আস্তানায় যেও, আমি তোমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব। যা বলি সেইমত কাজ করো—মুরাদের হাতে হাত রাখতে বললে রাখবে, তোমার আঁচল বিছিয়ে ওকে বসতে দেবে।

আচ্ছা।

মনে থাকবে সব কথা?

থাকবে।

সন্ন্যাসী এবার হাতে তালি দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করলো মুরাদ—বাবাজী আমাকে ডাকছেন?

হ্যাঁ বৎস, সময় সংকীর্ণ। আমাকে শীঘ্র যেতে হবে। তার পূর্বে আমি তোমার সাধনা শেষ করতে চাই। দেখো বৎস, ওকে আমি মন্ত্রে বশীভূত করে ফেলেছি। হাত পাতো-

মুরাদ দক্ষিণ হাত প্রসারিত করলো।

মনিরাকে ইঙ্গিত করলো সন্ন্যাসী তার হাতের ওপর হাত রাখতে।

মনিরা ধীরপদে এগিয়ে এসে মুরাদের হাতের ওপর দক্ষিণ হাতখানা রাখলো।

সন্ন্যাসী বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন।

মুরাদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। এত অল্প সময়ে মনিরা এতখানি বশীভূত হয়েছে—বড় আনন্দের কথা!

এবার সন্ন্যাসী মনিরাকে আঁচল পেতে বসতে বলে। মনিরা আঁচল পেতে বসলো। মুরাদকে বললো—বৎস, ওর আঁচলে বসো।

মুরাদ গুরুদেবের আদেশ পালন করলো।

কিছুক্ষণ সন্ন্যাসী মন্ত্র পাঠ করার পর বলে উঠলেন—আজ সাধনা শেষ হলো না, কিছু বাকি রইলো। তুমি কাল মনিরাকে নিয়ে আমার আস্তানায় এসো, বাকিটুকু শেষ করবো। সাবধান, সাধনা শেষ হবার পূর্বে যেন মনিরাকে স্পর্শ করো না, তাহলে সব পণ্ড হয়ে যাবে—আজ সময় সংকীর্ণ-আমি চললাম।

বাবাজী, আমি আপনাকে পৌঁছে দেব?

দরকার হবে না।

মুরাদ সন্ন্যাসী বাবাজীকে গুপ্ত গুহার বাইরে পৌঁছে দেয়। বিদায়কালে বার দুই সন্ন্যাসীর চরণধূলি গ্রহণ করে সে।

মনিরার নিখোঁজের পর চৌধুরী সাহেব এবং তার স্ত্রী মরিয়ম বেগমের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। অবিরত কাঁদা কাটি করে চলেছেন তাঁরা। চৌধুরী সাহেব একে ভাগনী মনিরার জন্য গভীরভাবে শোকাভিভূত হয়ে পড়েছেন, তদুপরি স্ত্রীর জন্য তিনি বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

সেদিন দ্বিপ্রহরে চৌধুরী সাহেব স্ত্রীর শিয়রে বসে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, এমন সময় বয় এসে জানালো-স্যার, ইন্সপেক্টর সাহেব এসেছেন, আপনার সঙ্গে জরুরি দরকার আছে।

চমকে উঠলেন চৌধুরী সাহেব, হঠাৎ এ সময়ে—কোন সন্ধান পেয়েছে কি তারা?

মরিয়ম বেগমও উদ্বিগ্ন হলেন, বলেন—ওগো, দেরী করো না-যাও, দেখো কি সংবাদ তাঁরা এনেছেন।

যাচ্ছি।

চৌধুরী সাহেব ড্রইংরুমে প্রবেশ করতেই দেখতে পেলেন মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন বসে আছেন। উভয়ের মুখমণ্ডলেই বেশ চঞ্চলতা ফুটে উঠেছে। চৌধুরী সাহেবকে দেখেই সালাম

জানালেন। তারপর মিঃ হারুন বললেন–চৌধুরী সাহেব, অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনার ভাগনী মিস মনিরার একটি চিঠি আমাদের হস্তগত হয়েছে।

মনিরা চিঠি লিখেছে–কই–কই সে চিঠি? ব্যস্তভাবে চৌধুরী সাহেব এগিয়ে গেলেন মিঃ হারুনের দিকে।

বসুন আমি দেখাচ্ছি। পকেট থেকে একটি ভাঁজকরা কাগজ বের করে বলেন এই নিন।

চৌধুরী সাহেব সোফায় বসে কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরেন। ধীরে ধীরে তাঁর মুখমণ্ডল স্বাভাবিক হয়ে এলো!

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চৌধুরী সাহেবের মুখমণ্ডল লক্ষ্য করছিলেন। এবার মিঃ হারুন জিজ্ঞাসা করলেন-চৌধুরী সাহেব, এই চিঠিখানা তাহলে সত্যিই আপনার ভাগনী মিস মনিরার হতের লেখা?

হ্যাঁ ইন্সপেক্টার।

তাহলে আপনার ভাগনী মিস মনিরা স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করেছে, সে এখন আপনার পুত্র দস্যু বনহুরের পাশে সুখে দিন কাটাচ্ছে।

চিঠিতে আপনি এখনও আপনার ভাগনীর অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকতে চান?

চৌধুরী সাহেব এ কথার কোন জবাব দিতে পারেন না, নিশ্চুপ থাকেন।

মিঃ হোসেন বলেন–একথা জানার পরও যদি আপনি ভাগনীর নিখোঁজ ব্যাপারে চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন, তবে এতে আপনার কলঙ্ক বাড়বে।

হ্যাঁ চৌধুরী সাহেব এখন আপনার শান্ত থাকাই উচিত। কারণ যে নারী স্বেচ্ছায় কোন পুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে যায় বা গৃহ ত্যাগ করে, তাকে খোঁজ করা বাতুলতা মাত্র। তাছাড়া বনহুর আপনারই পুত্র। এ কথাও আপনি একদিন আমাদের নিকট বলেছেন যে, আপনার সন্তানকে মনিরা ভালবাসে। বলেন মিঃ হারুন?

চৌধুরী সাহেব আনমনে বলেন—হ্যাঁ ইন্সপেক্টর সাহেব, মনিরা কি ভালবাসে।

তাহলে তো আপনার আর ব্যস্ত হবার কারণ নেই?

না।

মিঃ হারুন উঠে দাঁড়াল—চলি তাহলে চৌধুরী সাহেব?

চৌধুরী সাহেব নিরুত্তর, তিনি যেন পাথরের মূর্তির মতই স্তব্ধ হয়ে গেছেন।

মিঃ হারুন এবং হোসেন ড্রইংরুমে থেকে বেরিয়ে যান।

চৌধুরী সাহেব কলের পুতুলের মত ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। সিঁড়ির মুখেই উদ্বিগ্নভাবে দাঁড়িয়ে আছেন মরিয়ম বেগম। স্বামীকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে দেখে বলেন—কি সংবাদ, কেন এসেছিলেন ওরা?

চৌধুরী সাহেব কোন কথা না বলে হাতের চিঠিখানা মরিয়ম বেগমের হাতে দিলেন–পড়।

কার চিঠি?

মনিরার।

মনিরার চিঠি!

হ্যাঁ, পড়ে দেখ।

তুমিই পড়না, আমার চোখ কেমন যেন ঝাপসা হয়ে এসেছে। স্ত্রীর হাত থেকে আবার চিঠিখানা নিয়ে পড়তে শুরু করেন চৌধুরী সাহেব–

"মামুজান, তোমরা আমার জন্য মনে হয় খুব চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েছ। কিন্তু আমার জন্য তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি মনিরের সঙ্গে চলে এসেছি এবং এখন তার পাশে রয়েছি।"

— তোমাদের মনিরা

মরিয়ম বেগমের মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, খুশিভরা কণ্ঠে বলেন-মনিরাকে তাহলে কেউ ধরে নিয়ে যায়নি? খোদা তুমি আমাকে বাঁচালে।

রাগতঃকণ্ঠে বললেন চৌধুরী সাহেব-মান-ইজ্জতের মাথা খেয়ে সে আমাদের উদ্ধার করেছে-না? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, সব গেল, আমার কিছু আর বাকি রইলো না!

ওগো, কেন তুমি রাগ করছ? ওরা দু'জন দু'জনকে ভালবাসে-এ আমাদের সৌভাগ্য।

কলঙ্কটা কোথায় যাবে?

কলঙ্ক! কি যে বল, কিসের কলঙ্ক? মনিরার বিয়ে মনিরের সঙ্গেই হবে, এতে আবার কলঙ্ক কিসে?

তাই বলে এভাবে-না না, আমার সব গেল—মান-সম্মান-ইজ্জত সব গেল!

শান্ত হও। চলো,ঘরে চলো। স্বামীর হাত ধরে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন মরিয়ম বেগম।

❑

পুলিশ অফিস।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন ও অন্যান্য পুলিশ অফিসার বসে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল। শংকর রাওও সেখানে উপস্থিত রয়েছেন।

মনিরার ব্যাপার নিয়েই আলাপ চলছিল।

মিঃ হারুন বলেন—দেখলেন তো মিঃ রাও, আপনি বলেছিলেন মনিরাকে জোরপূর্বক চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিন্তু আসলে সে নিজেই বাড়ি থেকে চলে গেছে, তার প্রিয়জনের সঙ্গেই গেছে এবং এখন তার সঙ্গেই আছে।

শংকর রাও বিজ্ঞের মত মাথা দোলালেন-না, এটা আমি বিশ্বাস করি না মিঃ হারুন, কারণ আমি সেদিন চৌধুরী সাহেবের বাড়ির বেলকনিতে বেশ কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিলাম। তা ছাড়া মিস মনিরার স্যান্ডেল সিঁড়িতে পাওয়া গেছে।

আপনি কি তাহলে মিস মনিরার চিঠি অস্বীকার করেন?

হ্যাঁ করি। এমনওতো হতে পারে চিঠিখানা মিস মনিরার হাতের লেখার অনুকরণে লেখা হয়েছে!

অসম্ভব, কারণ তার মামা চৌধুরী সাহেব ভাগনীর হাতের লেখা বেশ চেনেন।

দেখুন মিঃ হারুন, মিস মনিরা যে স্বেচ্ছায় যায়নি তার আরও একটি জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ-চৌধুরী সাহেবের বাড়ির পুরানো দারোয়ানের খুন। দস্যু বনহুরের সঙ্গেই যদি সে স্বেচ্ছায় যাবে, তাহলে একটা নিরীহ লোককে কেন খুন করা হবে?

এই সামান্য ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারছেন না মিঃ রাও? যখন তারা চৌধুরী বাড়ি থেকে পালাচ্ছিল তখন হয়তো সেই দারোয়ান বাধা দিতে গিয়েছিল। দস্যুর আবার দয়ামায়া!

এমন সময় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক কক্ষে প্রবেশ করেন। চোখেমুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ। ভারী পাওয়ারের চশমাটা ভালো করে চোখের ওপর তুলে দিয়ে বলেন-ইন্সপেক্টর মিঃ হারুন কে?

মিঃ হারুন লোকটার আচমকা প্রবেশে মনে মনে রেগে গিয়েছিলেন, গম্ভীর কণ্ঠে বলেন-কি চান?

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন-আপনি বুঝি মিঃ হারুন?

হ্যাঁ, বলুন কি দরকার?

দেখুন, আমি মাধবগঞ্জের একজন ডাক্তার। আমার নাম নওশের আলী। গত রাতে আমাকে একজন লোক রোগী দেখার নাম করে ডেকে নিয়ে যায়। আমিও টাকার লোভে কিছু না ভেবে রোগী দেখতে যাই।

বসুন, বসে বলুন।

বৃদ্ধ বসে পড়ে বলতে শুরু করেন, আমাকে ওরা একটা ট্যাক্সিতে নিয়ে যায়। তারপর পায়ে হেঁটে-সে কি ভয়ংকর বন। বনের মধ্যে দিয়ে আমাকে নিয়ে ওরা যখন গন্তব্যস্থানে পৌঁছাল, তখন ভয়ে আমার কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছে। এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পারলাম, তবু নিশ্চুপ রইলাম, কারণ কিছু বলতে গিয়ে শেষে জীবনটা হারাব নাকি?

আগ্রহভরা কণ্ঠে বলেন মিঃ হারুন-তারপর?

তারপর একটা পর্বতের পাদমূলে আমাকে নিয়ে ওরা হাজির করল। সেই পর্বতের নিকটে দাঁড়িয়ে একটা লোক তিনবার শিস দিল, সঙ্গে সঙ্গে পর্বতের গায়ের একটা বিরাট পাথর এক পাশে সরে গেল।

কক্ষের সবাই উদ্বিগ্নচিত্তে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কথা শুনছেন। সকলেরই চোখেমুখে বিস্ময়। মিঃ রাও বলেন-বলুন, তারপর কি হলো?

দেখলাম পাথরটা সরে গিয়ে তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো এক সুড়ঙ্গপথ।

সেই পথের ভেতরে প্রবেশ করলেন বুঝি?

হ্যাঁ, তবে ভেতরে প্রবেশ করে স্তম্ভিত হলাম। তাদের কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম-তারা স্বাভাবিক লোক নয়। এই যে দেশময় রাহাজানি আর লুটতরাজ চলছে, নারীহরণ চলছে, এর নেপথ্যে রয়েছে সেই লোকগুলো। আসল কথা, তারা ডাকাতের দল এবং ওটা তাদের আস্তানা।

আশ্চর্য! অস্ফুটধ্বনি করে ওঠেন মিঃ হারুন।

ভদ্রলোক আবার বলেন—আমি তাদের কথাবার্তায় আরও বুঝতে পেরেছি-সেই পর্বতটার নাম জম্বুর পর্বত এবং ঐ জায়গাটা পর্বতের দক্ষিণ কোণে। ইন্সপেক্টার সাহেব, আপনার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি পুলিশ ফোর্স নিয়ে সেখানে যান। তারপর পকেট হাতড়ে একটি কাগজ বের করে এগিয়ে দেন এই নিন, আমি সেই পর্বতের গুপ্ত দরজার ছবি তৈয়ার করে এসেছি, এতে পথ-ঘাটের ছবি সুন্দর করে আঁকা রয়েছে।

মিঃ হোসেন বলে ওঠেন-কি রোগী দেখলেন তা তো বললেন না?

হাঁ বলছি, একটু থেমে বলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক-রোগীর কোন অসুখ নয়, শরীরে ভীষণ বেদনা আর জখম। হয়তো কোথাও মারধোর খেয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি ঔষুধপত্র দিয়ে বিদায় হলাম। ওরাই আবার আমাকে রেখে গেল। কিন্তু বাড়িতে নয়-একটা নির্জন পথের ধারে আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো ওরা। এই তো ভোরবেলার কথা। আমি বাড়িতে গিয়েই ওষুধের বাক্সটা রেখে ছুটে এসেছি। ইন্সপেক্টার, আপনি ওদের পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন। আপনি পুলিশ ফোর্স পাঠাবার ব্যবস্থা করুন সেখানে, নইলে পালাবে ওরা।

মিঃ হারুন বলেন-আপনাকেও যেতে হবে পথ দেখিয়ে দেবার জন্য।

আমি-আমি যে বুড়ো মানুষ।

তবে বলতে এলেন কেন? জানেন এটা পুলিশ অফিস-

"মামুজান, তোমরা আমার জন্য মনে হয় খুব চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েছ। কিন্তু আমার জন্য তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি মনিরের সঙ্গে চলে এসেছি এবং এখন তার পাশে রয়েছি।"

— তোমাদের মনিরা

মরিয়ম বেগমের মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, খুশিভরা কণ্ঠে বলেন–মনিরাকে তাহলে কেউ ধরে নিয়ে যায়নি? খোদা তুমি আমাকে বাঁচালে।

রাগতঃকণ্ঠে বললেন চৌধুরী সাহেব–মান-ইজ্জতের মাথা খেয়ে সে আমাদের উদ্ধার করেছে–না? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, সব গেল, আমার কিছু আর বাকি রইলো না!

ওগো, কেন তুমি রাগ করছ? ওরা দু'জন দু'জনকে ভালবাসে–এ আমাদের সৌভাগ্য।

কলঙ্কটা কোথায় যাবে?

কলঙ্ক! কি যে বল, কিসের কলঙ্ক? মনিরার বিয়ে মনিরের সঙ্গেই হবে, এতে আবার কলঙ্ক কিসে?

তাই বলে এভাবে–না না, আমার সব গেল—মান-সম্মান-ইজ্জত সব গেল!

শান্ত হও। চলো,ঘরে চলো। স্বামীর হাত ধরে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন মরিয়ম বেগম।

❑

পুলিশ অফিস।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন ও অন্যান্য পুলিশ অফিসার বসে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল। শংকর রাওও সেখানে উপস্থিত রয়েছেন।

মনিরার ব্যাপার নিয়েই আলাপ চলছিল।

মিঃ হারুন বলেন—দেখলেন তো মিঃ রাও, আপনি বলেছিলেন মনিরাকে জোরপূর্বক চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিন্তু আসলে সে নিজেই বাড়ি থেকে চলে গেছে, তার প্রিয়জনের সঙ্গেই গেছে এবং এখন তার সঙ্গেই আছে।

শংকর রাও বিজ্ঞের মত মাথা দোলালেন–না, এটা আমি বিশ্বাস করি না মিঃ হারুন, কারণ আমি সেদিন চৌধুরী সাহেবের বাড়ির বেলকনিতে বেশ কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিলাম। তা ছাড়া মিস মনিরার স্যান্ডেল সিঁড়িতে পাওয়া গেছে।

আপনি কি তাহলে মিস মনিরার চিঠি অস্বীকার করেন?

হ্যাঁ করি। এমনওতো হতে পারে চিঠিখানা মিস মনিরার হাতের লেখার অনুকরণে লেখা হয়েছে!

অসম্ভব, কারণ তার মামা চৌধুরী সাহেব ভাগনীর হাতের লেখা বেশ চেনেন।

দেখুন মিঃ হারুন, মিস মনিরা যে স্বেচ্ছায় যায়নি তার আরও একটি জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ–চৌধুরী সাহেবের বাড়ির পুরানো দারোয়ানের খুন। দস্যু বনহুরের সঙ্গেই যদি সে স্বেচ্ছায় যাবে, তাহলে একটা নিরীহ লোককে কেন খুন করা হবে?

এই সামান্য ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারছেন না মিঃ রাও? যখন তারা চৌধুরী বাড়ি থেকে পালাচ্ছিল তখন হয়তো সেই দারোয়ান বাধা দিতে গিয়েছিল। দস্যুর আবার দয়ামায়া!

এমন সময় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক কক্ষে প্রবেশ করেন। চোখেমুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ। ভারী পাওয়ারের চশমাটা ভালো করে চোখের ওপর তুলে দিয়ে বলেন–ইন্সপেক্টর মিঃ হারুন কে?

মিঃ হারুন লোকটার আচমকা প্রবেশে মনে মনে রেগে গিয়েছিলেন, গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—কি চান?

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন—আপনি বুঝি মিঃ হারুন?

হ্যাঁ, বলুন কি দরকার?

দেখুন, আমি মাধবগঞ্জের একজন ডাক্তার। আমার নাম নওশের আলী। গত রাতে আমাকে একজন লোক রোগী দেখার নাম করে ডেকে নিয়ে যায়। আমিও টাকার লোভে কিছু না ভেবে রোগী দেখতে যাই।

বসুন, বসে বলুন।

বৃদ্ধ বসে পড়ে বলতে শুরু করেন, আমাকে ওরা একটা ট্যাক্সিতে নিয়ে যায়। তারপর পায়ে হেঁটে—সে কি ভয়ংকর বন। বনের মধ্যে দিয়ে আমাকে নিয়ে ওরা যখন গন্তব্যস্থানে পৌঁছল তখন ভয়ে আমার কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছে। এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পারলাম, তবু নিশ্চুপ রইলাম, কারণ কিছু বলতে গিয়ে শেষে জীবনটা হারাব নাকি?

আগ্রহভরা কণ্ঠে বলেন মিঃ হারুন—তারপর?

তারপর একটা পর্বতের পাদমূলে আমাকে নিয়ে ওরা হাজির করল। সেই পর্বতের নিকটে দাঁড়িয়ে একটা লোক তিনবার শিস দিল, সঙ্গে সঙ্গে পর্বতের গায়ের একটা বিরাট পাথর এক পাশে সরে গেল।

কক্ষের সবাই উদ্বিগ্নচিত্তে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কথা শুনছেন। সকলেরই চোখেমুখে বিস্ময়। মিঃ রাও বলেন—বলুন, তারপর কি হলো?

দেখলাম পাথরটা সরে গিয়ে তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো এক সুড়ঙ্গপথ।

সেই পথের ভেতরে প্রবেশ করলেন বুঝি?

হ্যাঁ, তবে ভেতরে প্রবেশ করে স্তম্ভিত হলাম। তাদের কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম—তারা স্বাভাবিক লোক নয়। এই যে দেশময় রাহাজানি আর লুটতরাজ চলছে, নারীহরণ চলছে, এর পেছনে রয়েছে সেই লোকগুলো। আসল কথা, তারা ডাকাতের দল এবং ওটা তাদের আস্তানা।

আশ্চর্য! অস্ফুটধ্বনি করে ওঠেন মিঃ হারুন।

ভদ্রলোক আবার বলেন—আমি তাদের কথাবার্তায় আরও বুঝতে পেরেছি—সেই পর্বতটার নাম জম্বুর পর্বত এবং ঐ জায়গাটা পর্বতের দক্ষিণ কোণে। ইন্সপেক্টর সাহেব, আপনার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি পুলিশ ফোর্স নিয়ে সেখানে যান। তারপর পকেট হাতড়ে একটি কাগজ বের করে এগিয়ে দেন এই নিন, আমি সেই পর্বতের গুপ্ত দরজার ছবি তৈয়ার করে এনেছি, এতে পথ-ঘাটের ছবি সুন্দর করে আঁকা রয়েছে।

মিঃ হোসেন বলে ওঠেন—কি রোগী দেখলেন তা তো বললেন না?

হাঁ বলছি, একটু থেমে বলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক—রোগীর কোন অসুখ নয়, শরীরে তীব্র বেদনা আর জখম। হয়তো কোথাও মারধোর খেয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি ঔষুধপত্র দিয়ে বিদায় হলাম। ওরাই আবার আমাকে রেখে গেল। কিন্তু বাড়িতে নয়—একটা নির্জন পথের ধারে আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো ওরা। এই তো ভোরবেলার কথা। আমি বাড়িতে গিয়েই ওষুধের বাক্সটা রেখে ছুটে এসেছি। ইন্সপেক্টর, আপনি ওদের পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন। আপনি পুলিশ ফোর্স পাঠাবার ব্যবস্থা করুন সেখানে, নইলে পালাবে ওরা।

মিঃ হারুন বলেন—আপনাকেও যেতে হবে পথ দেখিয়ে দেবার জন্য!

আমি—আমি যে বুড়ো মানুষ।

তবে বলতে এলেন কেন? জানেন এটা পুলিশ অফিস—

আমি এতটুকুও মিথ্যা বলিনি। কিন্তু রাত শেষ প্রহরে যাবেন, তার পূর্বে নয়।

আপনি যেতে পারবেন না?

আমার শরীর ভাল নয়, এইটুকু পথ এসেই হাঁপিয়ে পড়েছি।

শংকর রাও বলেন–মিঃ হারুন, ইনি যা বলছেন তা সত্য। আপনি এর কথামতই কাজ করুন, কারণ আমার মনে হয় সেই দুষ্ট শয়তানের দল পালিয়ে জম্বুর পর্বতে আশ্রয় নিয়েছে।

মিঃ হোসেন মিঃ শংকর রাওয়ের কথায় যোগ দেন–হ্যাঁ,আমারও সেই রকমই মনে হয়।

ভদ্রলোক তাঁর পুরা নাম ঠিকানা দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন।

ভদ্রলোক চলে যেতেই শংকর রাও বলেন–মিঃ হারুন, আপনি কি মনে করছেন?

হ্যাঁ, একবার যেতেই হবে সেখানে। লোকটার কথা বোধ হয় মিথ্যা নয়। তারপর ঐ ভদ্রলোকের দেয়া ম্যাপখানা মেলে ধরলেন টেবিলে।

মিঃ হারুন, মিঃ রাও এবং মিঃ হোসেনের মধ্যে ম্যাপ নিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা চললো, তারপর উঠে পড়লেন সকলে।

সন্ধ্যার পূর্বেই পুলিশ-ফোর্স নিয়ে তৈরি হয়ে নিলেন মিঃ হারুন। পুলিশদেরকে অগ্রসর হবার অতি গোপনে জম্বুর পর্বতের দিকে রওনা দিতে নির্দেশ দিলেন। বহু দূরের পথ এই জম্বুর পর্বত। বহু বন, ঝোপঝাড়, ছোট ছোট পাহাড় টিলা পার হয়ে তবেই তারা পৌঁছবে সেই পর্বতে।

মিঃ হারুন আর মিঃ হোসেনের সঙ্গে শংকর রাও-ও চললেন। মিঃ হারুন টর্চলাইট ধরে পথ চিনে নিচ্ছিলেন। ম্যাপখানা এত সুন্দরভাবে আঁকা হয়েছিল যে, পথ চিনে নিতে এতটুকু কষ্ট হচ্ছিল না তাঁদের।

জম্বুর পর্বতের পাদমূলে পৌঁছে রেডিয়াম হাতঘড়ির দিকে তাকালেন মিঃ হারুন। রাত তখন তিনটে, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁরা এই পথ ধরে এসেছেন।

টর্চের আলো ফেলে আর একবার ম্যাপ দেখে নিলেন মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন। খুশিতে তাঁরা আত্মহারা হলেন–ঠিক জায়গায় পৌঁছতে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন! ম্যাপ ধরে আরও কিছুটা দক্ষিণে এগুলেন, কিন্তু কই, এখানে তো কোন সুড়ঙ্গ বা পথের চিহ্ন নেই। শুধু পাথর আর পাথরে পর্বতের গা ঢাকা রয়েছে। স্থানে স্থানে ছোট ছোট আগাছা আর ঝোপঝাড়। আর রয়েছে অশ্বত্থ বৃক্ষ ও নাম না জানা কত বড় বড় গাছ।

মিঃ হারুন পর্বতের পাশে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালেন–হ্যাঁ, তাঁর পুলিশ ফোর্স এসে পৌঁছে গেছে। এক-একজন এক একটা গাছের গুড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে।

মিঃ হোসেন এবং শংকর রাও গুলীভরা রিভলবার হাতে মিঃ হারুনের পেছনে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রইলেন।

মিঃ হারুন মুখের মধ্যে দুটি আংগুল দিয়ে খুব জোরে শিস দিলেন–একবার দু'বার তিন বার। হঠাৎ একটা হুড় হুড় শব্দ কানে এলো তাঁদের। মিঃ হারুন আশ্চর্য হয়ে দেখলেন–তাঁর সামনে পর্বতের গা থেকে একটি বিরাট পাথর একদিকে সরে যাচ্ছে। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাঁর মুখমণ্ডল। তিনি স্পষ্ট দেখলেন–পর্বতের গায়ে একটি সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে এসেছে।

মিঃ হারুন সুড়ঙ্গপথে গিয়ে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশিতে ফুঁ দিলেন। অমনি পুলিশ ফোর্স এবং মিঃ হোসেন ও শংকর রাও সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করলেন।

মিঃ হারুন এবং পুলিশ ফোর্স ভেতরে প্রবেশ করতেই দু'জন মশালধারী মশাল দূরে নিক্ষেপ করে ছুটে পালাল।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন মশাল দু'টি কুড়িয়ে নিয়ে রিভলবার উদ্যত করে দ্রুতগতিতে এগুলেন, পেছনের পুলিশ ফোর্স ছড়িয়ে পড়ল সুড়ঙ্গের ভেতরে।

অল্পক্ষণের মধ্যে দশজন ডাকাতকে তাঁরা পাকড়াও করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু নাথুরামকে তারা ধরতে পারলেন না। নাথুরাম একটি গুপ্তগর্তে আত্মগোপন করে রইলো।

তখন মুরাদ মনিরাকে নিয়ে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছে। তাই মিঃ হারুনের হাত থেকে বাঁচা পরিত্রাণ পেল সে।

মিঃ হারুন ডাকাতের দলকে পাকড়াও করে নিয়ে চললেন। পূর্ব আকাশ; তখন ফর্সা হয়ে আসছে।

সবাই চলে যাবার পর নাথুরাম তার গুপ্ত গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো, দাঁতে দাঁত পিষে বলল, একটি আগেও যদি জানতাম তাহলে সমস্ত পর্বতটাকে উড়িয়ে পুলিশ বাহিনীর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে ফেলতাম। তার কর্কশ কণ্ঠের প্রতিধ্বনি গুপ্ত গুহার দেয়ালে আঘাত খেয়ে ছড়িয়ে পড়ে গোটা সুড়ঙ্গপথে।

মুরাদ আর মনিরা তখন জম্বুর বনের মধ্য দিয়ে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।

সন্ন্যাসী বাবাজীর সামনে অগ্নিকুণ্ড দপ দপ করে জ্বলছে। পাশেই ধূমায়িত গাঁজার কলকে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে। সন্ন্যাসী দু'চোখ মুদিত অবস্থায় বিড়বিড় করে মন্ত্র পাঠ করছেন।

সময় অতিবাহিত প্রায়, এতক্ষণেও এলো না ভক্ত মুরাদ তার প্রিয়া মনিরাকে নিয়ে।

এমন সময় পদশব্দ শোনা যায়। একটু পরই মুরাদের উপস্থিতি জানতে পারেন সন্ন্যাসী বাবাজী। গম্ভীর স্থিরকণ্ঠে বলেন—মুরাদ, বড় বিলম্ব হয়ে গেছে, শিগগির প্রস্তুত হয়ে নাও।

মুরাদের দু'চোখে আনন্দের দ্যুতি খেলে যায়। সত্যিই বাবাজীর অপূর্ব ধ্যানবল। তাকে না দেখেই তার নাম উচ্চারণ করেছেন। করজোরে বলে মুরাদ—বাবাজী, আদেশ করুন কি করতে হবে?

তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াও, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

মুরাদ স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

মনিরা একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

সন্ন্যাসী বাবাজী আসন ত্যাগ করেন, এগিয়ে আসেন মুরাদের দিকে...হঠাৎ প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দেন তার নাকের ওপর।

অমনি চিৎ হয়ে পড়ে যায় মুরাদ। এমন একটা অবস্থার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে যায় সে। তারপর বুঝতে পারে সন্ন্যাসী বাবাজী তার হিতাকাঙ্ক্ষী নয়।

মুরাদ উঠে দাঁড়াবার পূর্বেই সন্ন্যাসী পুনরায় মুরাদকে আক্রমণ করেন এবং ঘুষির পর ঘুষি লাগিয়ে ওকে আধমরা করে ফেলেন।

মুরাদের নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। ঠোঁট কেটেও রক্ত ঝরছে। মুরাদও রুখে দাঁড়াতে যায়। কিন্তু তার পূর্বেই সন্ন্যাসী হাতে তালি দেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পুলিশ বেরিয়ে আসে পাশের ঝোপ-ঝাপের মধ্য থেকে। সন্ন্যাসীর ইংগিতে তারা মুরাদের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দেয়।

মুরাদের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। মৃতের মুখের ন্যায় রক্তশূন্য হয়ে পড়ে তার মুখমণ্ডল। নিজেকে ধিক্কার দেয় সে। নিজে তো বন্দী হলোই, তার এত আরাধনার ধন মনিরাকেও হারালো। রাগে ক্ষোভে নিজের মাংস নিজেই চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে তার।

মুরাদকে নিয়ে পুলিশরা চলে যায়।

সন্ন্যাসী মনিরার সামনে এসে দাঁড়াল—তুমি এখন কি চাও?

মনিরা এতক্ষণ অপলক নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। মনে তার শত শত প্রশ্ন একসঙ্গে দোলা দিচ্ছিল। সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই পুলিশের লোক। সে কি ভুল করেছে? এর কাছে সব কথা খুলে

...লা ঠিক হয়নি। দস্যু বনহুরকে সে ভালবাসে একথাও বলেছে সে তার কাছে। কি সর্বনাশ সে

...বলেছে। মনে মনে ভয় পেয়ে যায় মনিরা। কোন জবাব না দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে।

সন্ন্যাসী মনিরার মনোভাব বুঝতে পেরে হেসে বলেন-তুমি কোথায় যেতে চাও? মামা-

...মীর কাছে-না দস্যু বনহুরের পাশে

মনিরা মৃদুকম্পিত সুরে বলে—মামা-মামীর কাছে।

...বেশ, এসো আমার সঙ্গে।

সন্ন্যাসী আগে আগে চলেন, মনিরা চলে পেছনে পেছনে। কিছুদূর এগুনোর পর একটি

...দেখতে পায় মনিরা।

সন্ন্যাসী মনিরাকে পাল্কীতে উঠে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

মনিরা পাল্কীতে বসে কতকটা আশ্বস্ত হলো। যা হউক সন্ন্যাসী যেই হউক সে তাকে তার

...মামীর কাছে পৌঁছে দেবে।

কিন্তু একি! এ যে গহন বনের ভেতর দিয়ে এরা তাকে নিয়ে চলেছে।

মনিরা উঁকি দিয়ে চারদিকে দেখলো।

দু'জন লোক মশাল হাতে আগে আগে চলেছে। মশালের আলোতে লক্ষ্য করলো মনিরা—

...ন্যাসী তো নেই। সে তবে গেল কোথায়!

ভোর হবার পূর্বে একটা পোড়োবাড়ীর সামনে এসে পাল্কী থেমে পড়লো। দু'জন মশালধারী

মনিরাকে লক্ষ্য করে বলল-নেমে আসুন।

মনিরা ইতস্ততঃ করতে লাগল।

মশালধারী দু'জনের একজন বলে ওঠে-ভয় নেই, আসুন।

মনিরার হৃদয় কেঁপে উঠল, সে আবার এক নতুন বিপদের সম্মুখীন হলো নাকি। পোড়াবাড়ির দিকে তাকিয়ে কণ্ঠনালী শুকিয়ে উঠলো তার। কিন্তু নিরুপায় সে। কি আর করবে, অগত্যা মশালধারী লোক দুটিকে অনুসরণ করল সে।

অনেকগুলো ভাঙ্গা ঘর আর প্রাচীর পেরিয়ে একটি গুপ্ত দরজার নিকটে পৌঁছল তারা। মশালধারী দু'জন এবার দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন বলল-ভেতরে যান।

মনিরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা বাড়ালো। না জানি এ আবার কোন বিপদে পড়লো সে। সন্ন্যাসী-সেও কি তার সাথে চাতুরি করল। হৃদয়টা অজানা এক আশঙ্কায় কেঁপে উঠল।

কক্ষে প্রবেশ করে আশ্চর্য হলো মনিরা। সুন্দর পরিচ্ছন্ন একটি কক্ষ। এই পোড়াবাড়ির মধ্যে এমন পরিষ্কার সাজানো গোছানো ঘর থাকতে পারে, ভাবতে পারে না মনিরা। অবাক হয়ে চারদিকে তাকায় সে। মেঝেতে দামী কার্পেট বিছানো। দেয়ালে সুন্দর কয়েকখানা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। একপাশে একটি মূল্যবান খাট, খাটে দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাতা রয়েছে, কয়েকখানা দামী সোফা সাজানো। মনিরা অবাক হয়ে দেখছে, এই গহন বনের ভেতর একটা পোড়াবাড়ির মধ্যে এত সুন্দর একটি কক্ষ!

হঠাৎ মনিরার নজরে পড়লো, এক পাশে একটা ছোট্ট টেবিল। টেবিলে স্তূপাকার ফলমূল। নাশপাতি, বেদানা, কমলালেবু, আংগুর আরও অনেক রকম ফল সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে।

এসব দেখেও মনিরা খুশি হতে পারলো না। না জানি তার জন্য আবার কোন বিপদ এগিয়ে আসছে। তার জন্য এত ব্যবস্থার দরকার কি? সন্ন্যাসীর যদি মতিগতি ভালই হত, তাহলে তাকে তার মামা-মামীর নিকটে পৌঁছে না দিয়ে এখানে আনবার কারণ কি? নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয় মনিরা—তার অদৃষ্টে এত ছিল! চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করে মনিরার। কিন্তু কেঁদে কি হবে! এতদিন কেঁদে কেঁদে চোখের পানি তার যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

এক সময় ভোরের আলো ফুটে উঠল।

গাছে গাছে জেগে উঠল পাখির কলরব। মৃদুমন্দ বাতাস অজানা ফুলের সুরভি নিয়ে ছুটে এলো মুক্ত জানালাপথে। মনিরা দুগ্ধফেনিভ শয্যায় গা এগিয়ে দিল। চোখের পানি তার শুকিয়ে গেছে। ব্যথা সয়ে সয়ে হৃদয়টাও হয়ে উঠেছে পাথরের মত শক্ত।

কত দিন এমন সুন্দর বিছানায় শোয়নি সে। গোটা রাতের অনিদ্রায় দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মনিরা কখন যে ঘুমিয়ে পড়লো নিজেই জানে না।

মিঃ হারুন ডাকাতের দলকে গ্রেপ্তার করে খুশিতে মেতে উঠেছেন! তাঁর জীবনে এটা এক চরম সাফল্য। মিঃ হোসেন এবং শংকর রাও-ও আনন্দে আত্মহারা। পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদ এই ভয়ংকর ডাকাতের দল গ্রেপ্তার হওয়ায় তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। নিজে এসে তিনি দেখলেন, জবানবন্দিও নিলেন।

ডাকাতের দলের লোকগুলোর ভয়ংকর চেহারা দেখে এবং তাদের জবানবন্দি শুনে মিঃ আহম্মদ লোকগুলোকে হাঙ্গেরী কারাগারে আটকে রাখতে বললেন। বিচারের সময় আবার তাদের বের করে আনা হবে।

মিঃ আহম্মদের কথামতই কাজ হলো।

ডাকাতের দলকে হাঙ্গেরী কারাগারে প্রেরণ করার পর পরই কয়েকজন পুলিশ মুরাদকে পাকড়াও করে হাজির হলো—হুজুর, এই লোকটাও ছিল ডাকাতদের দলে।

মিঃ হারুন এবং শংকর রাও অবাক হয়ে দেখলেন, এ যে খান বাহাদুর হামিদুল হকের লন্ডন ফেরত পুত্র মুরাদ!

মুরাদের শরীরে অনেকগুলো আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেলেন তাঁরা। একটা চোখের ওপরে কালো জখম হয়ে রয়েছে। ঠোঁট কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল, এখনও তা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়নি। চোয়ালের নিচেও একটা জখম রয়েছে।

এমন সময় গতদিনের সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন ও অন্যান্য পুলিশ অফিসার প্রৌঢ় ডাক্তারকে দেখে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। মিঃ হারুন উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন—আসুন, আসুন!

প্রৌঢ় ডাক্তার আসন গ্রহণ করে বললেন—এবার আমার কথা কাজে এসেছে তো?

হ্যাঁ ডাক্তার সাহেব, আপনার কথামত কাজ করে আমরা আজ এক ভয়ংকর ডাকাতদলকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু আর একটা সমস্যার সামনে পড়েছি এই যুবককে নিয়ে।

ডাক্তার তার মোটা পাওয়ারের চশমা নাকের ওপর থেকে চোখের ওপর তুলে দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন। অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বলেন—এই সেই লোক, যাকে আমি সেই দিন চিকিৎসা করেছিলাম। আংগুল দিয়ে ওর জখমগুলো দেখিয়ে দিয়ে বলেন-এই দেখছেন সেই জখমগুলো।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ওপর পুলিশ অফিসারগণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল। এখন মুরাদ সেই ডাকাতদলের একজন বলে প্রমাণিত হওয়ায় তাকেও তাঁরা হাজতে প্রেরণ করলেন।

মুরাদ হাজতে যাবার পূর্বে একবার কটমট করে তাকালো। বৃদ্ধকে মিথ্যা বলতে শুনে আশ্চর্য হলো সে। বৃদ্ধকে সে কোনদিন দেখেছে বলেও মনে পড়লো না। অথচ সে বলছে তাকে চিকিৎসা করেছে। জানে প্রতিবাদ জানিয়ে কোন ফল হবে না, তাই নীরব রইল সে।

মুরাদকে হাজতে পাঠানোর পর মিঃ হারুন বলেন—চলুন ডাক্তার সাহেব, পুলিশ সুপারের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেই। সত্যিই আপনি একজন মহৎ ব্যক্তি।

চলুন, উঠে দাঁড়ালেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

মিঃ হারুন মিঃ আহম্মদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে ঘটনাটি বিস্তারিত বলেন।

সব শুনে এবং প্রৌঢ় ভদ্রলোকটার অসীম বুদ্ধি বল দেখে মিঃ আহমদ মুগ্ধ হলেন। তিনি হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলেন-আপনাকে আমরা পুরস্কৃত করব।

হেসে বলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক-পুরস্কার আমি চাই না। আপনি সেই অর্থ দুস্থ লোকদের দান করবেন। আচ্ছা, আজকের মত চলি। পুলিশ সুপারের সাথে হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিলেন তিনি।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক পুলিশ অফিস থেকে বিদায় গ্রহণ করার পর মিঃ হারুন এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার নিজ নিজ কাজে মনোযোগ দিলেন।

এমন সময় বয় একটা চিঠি এনে মিঃ হারুনের হাতে দিয়ে বলল—যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক এইমাত্র পুলিশ অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন, তিনি এই চিঠিখানা আপনাকে দিতে বলে গেলেন।

মিঃ হারুন একটু অবাক হলেন, এইতো তাঁর সঙ্গে সামনা সামনি সমস্ত কথাবার্তা হলো, আবার চিঠিতে কি লিখলেন।

শংকর রাও বলেন—হয়তো কোনো গোপন কথা ওতে লিখে গেছেন।

মিঃ হারুন দ্রুতহস্তে খামখানা ছিড়ে চিঠিখানা বের করে নিলেন-ছোট্ট একটুকু চিরকুট তাতে লেখা রয়েছে, "আপনাদের কাজে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। অশেষ ধন্যবাদ।"

—দস্যু বনহুর

মিঃ হারুনকে হতবাক হয়ে যেতে দেখে মিঃ হোসেন কাগজের টুকরাখানা হাতে নিয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন-গ্রেপ্তার করো! গ্রেপ্তার করো! দস্যু বনহুর! দস্যু বনহুর।

সমস্ত পুলিশ রাইফেল হাতে ছুটলো, কিন্তু কোথায় দস্যু বনহুর।

পুলিশ সুপার মিঃ আহমদ রাগে-ক্ষোভে অধর দংশন করলেন। পূর্বে যদি এতটুকু জানতে পারতেন, তাহলে আজ তারা দস্যু বনহুরকে কিছুতেই পালাতে দিতেন না। মিঃ হারুন এবং অন্যান্য অফিসারের অবস্থাও তাই।

শংকর রাও শুধু হেসে বলেন-কেন এত ব্যস্ত হচ্ছেন? দস্যু বনহুর তো আর কোন দোষ করেনি?

মিঃ হারুন রাগত কণ্ঠে বলেন—দোষীকে নতুন করে দোষ করতে হয় না মিঃ রাও। দোষী সব সময়ই অপরাধী। সুযোগ পেলে সে ছোবল মারবেই।

অনেক খোঁজাখুজি করেও দস্যু বনহুরকে আর পাওয়া গেল না।

মিঃ হোসেন এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মিঃ হারুন নিজেও বেরিয়ে পড়লেন, যাকে সন্দেহ হলো তাকেই পাকড়াও করলেন।

মিঃ আহমদ কড়া হুকুম দিলেন—দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা চাই-ই।

মিঃ আহমদ দস্যু বনহুরের ওপর চটে রয়েছেন, কারণ সে তাঁকে কিছুদিন আগে ভয়ানক নাকানি চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে। তাই দস্যু বনহুর যত ভাল কাজই করুক তবু সে তার চক্ষুশূল, তাছাড়া সে অপরাধী —দস্যু।

পুলিশমহলে দস্যু বনহুরকে নিয়ে আবার একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল।

এদিকে দস্যু বনহুরের খোঁজে পুলিশ যখন হন্তদন্ত হয়ে ছুটাছুটি করছে তখন বনহুর নিজের আস্তানায় একটা আসনে অর্ধশায়িত অবস্থান ঠেস দিয়ে বসে আছে। পায়ের কাছে একটি নিচু আসনে বসে রয়েছে রহমান।

বনহুর আর রহমানের মধ্যে মনসাপুরের জমিদার ব্রজবিহারী রায়ের কন্যা সুভাষিণীর অসুস্থতা নিয়ে আলোচনা চলছিল। কিছুদিন পূর্বেও রহমান বনহুরের নিকটে সুভাষিণীর অসুখের

কথা বলেছিল। বনহুর মনিরার নিখোঁজ ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, যার জন্য অন্য কিছু ভাববার সময় হয় নি তার।

আজ কিন্তু বনহুর সুস্থির থাকতে পারে না। রহমানের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনে তারপর উঠে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ পায়চারী করে। ললাটে ফুটে ওঠে তার গভীর চিন্তারেখা।

রহমান বলে ওঠে—সর্দার, মেয়েটা যাকে ভালবাসে তাকে পাওয়া অসম্ভব।

থমকে দাঁড়িয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে বনহুর—অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। আমি তো পূর্বেই বলেছি, যত অর্থ চায় দেব। নাহলে জোরপূর্বক তাকে পাকড়াও করে আনব।

বনহুরের কথায় রহমান কোন জবাব দেয় না, শুধু তার মুখে এক রহস্যময় হাসি ফুটে মিলিয়ে যায়। বনহুর তা লক্ষ্য করে না।

বনহুর পুনরায় পায়চারী শুরু করে।

❑

মনসাপুরের জমিদার ব্রজবিহারী রায় কাচারী কক্ষে বসে ধূমপান করছিলেন। ললাটে তাঁর গম্ভীর চিন্তারেখা। তাঁর একমাত্র কন্যার অসুস্থতার জন্য আজ সমস্ত মনসাপুরে একটা অশান্তির কালো ছায়া বিরাজ করছে। কত ডাক্তার কবিরাজ এলো, সবাই বিফল হয়ে ফিরে গেছে। কেউ সুভাষিণীকে আরোগ্য করতে সক্ষম হলো না।

ব্রজবিহারী রায়ের মনে শান্তি নেই। কন্যার অসুস্থতার জন্য তিনিও একরকম আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। স্ত্রী জ্যোতির্ময়ী দেবীর অবস্থাও তাই। সুভাষিণীর জন্য তাঁরা অবিরত অশ্রু বিসর্জন করে চলেছেন।

আজ দুদিন হলো সুভাষিণীর অবস্থা আরও খারাপ। ব্রজবিহারী রায় কাচারী কক্ষে বসে কন্যা সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন, এমন সময় দারোয়ান এসে জানাল—বাবু, একজন ডাক্তার এসেছেন, দিদিমণিকে চিকিৎসা করতে চান।

ব্রজবিহারী বাবু প্রথমে কথাটা কানেই নিলেন না। কারণ তার কন্যার অসুস্থতার কথা শুনে পর্যন্ত মোটা টাকার লোভে কত ডাক্তারই এলেন আর গেলেন তার ঠিক নেই। তবু তাচ্ছিল্য করে বলেন—নিয়ে এসো।

একটু পরে ডাক্তারসহ দারোয়ান কক্ষে প্রবেশ করলো। ব্রজবিহারী বাবু দারোয়ানকে বেরিয়ে যেতে ইঙ্গিত করলেন। দারোয়ান কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে যেতেই ব্রজবিহারী বাবু সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালেন ডাক্তারের দিকে।

ডাক্তারের উজ্জ্বল দীপ্ত চেহারা ব্রজবিহারী বাবুর মনে শ্রদ্ধার রেখা টানল। বিশেষ করে প্রৌঢ় ডাক্তারের গভীর নীল চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে তাকে উপেক্ষা করতে পারলেন না রায়বাবু।

উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে নিজের পাশে বসালেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার কন্যা সম্বন্ধে আপনি সব শুনেছেন?

আমি শুধু শুনেছি আপনার কন্যা অসুস্থ, তাকে আরোগ্য করার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন।

ওঃ আপনি তাহলে আমার কন্যার সম্বন্ধে না জেনেই এসেছেন?

হাঁ, আমি আপনার কন্যার রোগ সম্বন্ধে কিছু জানি না। যদি দয়া করে তার অসুখ সম্বন্ধে বলেন তাহলে আমার পক্ষে সুবিধা হবে।

তবে শুনুন।

বলুন?

ব্রজবিহারী বাবু কতটা আনমনা হয়ে পড়লেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, ডাক্তার আমার ঐ একটা মাত্র মেয়ে। আজ সে মরণের পথে এগিয়ে চলেছে। যেমন করে হোক ওকে বাঁচাতেই হবে ডাক্তার। আপনি যত টাকা চান কন্যার জীবনের বিনিময়ে আমি আপনাকে তাই দেব।

ওর অসুখ সম্বন্ধে জানতে চাইছি রায়বাবু।

একটা ঢোক গিলেন ব্রজবিহারী রায়, চোখ দুটো তার ছলছল হয়ে ওঠে। ধীরকণ্ঠে বললেন—আজ প্রায় বছর হয়ে এলো আমার কন্যা পুষ্পগঞ্জে তার মাতুলালয়ে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে আসতে তার রাত হয়ে যায়। পাল্কী করেই ফিরছিল সে। তার সঙ্গে ছিল একজন বন্দুকধারী পাহারাদার আর একজন ঝি। পথে দস্যুর কবলে পড়ে পাহারাদারগণ নিহত হয়, ঝিটাও মারা পড়ে কিন্তু ভগবানের অশেষ কৃপায় আমার কন্যাকে একজন পথিক রক্ষা করে।

তারপর?

তারপর সুভাকে সেই ভদ্রলোকই বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেন। কি জানি ডাক্তার, তারপর থেকে লক্ষ্য করেছি—আমার সুভা যেন কেমন হয়ে গেছে। তার মুখে হাসি নেই, সময়মত নাওয়া খাওয়া নেই। সব সময় কেমন যেন আনমনা ভাব। অনেক চিকিৎসা করলাম কিন্তু মেয়ের কোন পরিবর্তন হয় না। আমার পুত্রবধূর পরামর্শে বিয়ে দেব ঠিক করলাম— কিন্তু কি হল জানেন?

বলুন?

যেদিন বিয়ে তার আগের রাতে সুভা পালাল।

ডাক্তার স্তব্ধ নিঃশ্বাসে শুনে যাচ্ছেন। ব্রজবিহারী রায়ের কথাগুলো তিনি মনে মনে গভীরভাবে তলিয়ে দেখছেন, ব্যথিত পিতার অন্তরের ব্যথা ডাক্তারের হৃদয়ে আঘাত করতে লাগলো বলেন—বলুন তারপর?

কদিন তার কোন সন্ধান পেলাম না। ওর মা তো ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করলো। হঠাৎ একদিন তাকে পেলাম। কে এক জন ভদ্রলোক তাকে অজ্ঞান অবস্থায় হসপিটালে ভর্তি করে দিয়েছিলেন খবর পেয়ে তাকে নিয়ে এলাম বাড়িতে কিন্তু আসার পর সে আর কারও সঙ্গে কথা বলে না জোর করে দু'টি খাওয়াতে হয়, জোর করে স্নান করাতে হয়। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কি যে বলে বুঝা যায় না।

ডাক্তার সোজা হয়ে বসলেন, আগ্রহভরা কণ্ঠে বলেন—এখনও সে ঐ রকম অবস্থায় আছে?

হ্যাঁ, ডাক্তার, এখনও ঠিক ঐ অবস্থায় রয়েছে। চলুন তাকে দেখবেন।

ব্রজবিহারী রায় উঠে অন্দরবাড়ির দিকে এগুলেন। ডাক্তার তাঁকে অনুসরণ করলেন। কিন্তু মনে তার এক গভীর চিন্তা জোট পাকাচ্ছিল। এসব কথা মানে কি? জমিদার বাবু যা বলছেন তা যেন অত্যন্ত জটিল রহস্যজনক।

ডাক্তার জমিদার ব্রজবিহারী রায়ের সঙ্গে সুভাষিণীর কক্ষে প্রবেশ করলেন।

আঁচলে মুখ ঢেকে বিছানায় চুপ করে শুয়ে আছে একটি মহিলা। ডাক্তার বুঝতে পারলেন মহিলাটি অন্য কেউ নয়—জমিদার কন্যা সুভাষিণী।

ব্রজবিহারী রায় এবং ডাক্তার সুভাষিণীর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু মুখের আঁচল সরালো না সুভাষিণী। যেমন শুয়ে ছিল তেমনি রইল। ডাক্তার একটু কেশে শব্দ করলেন। মনে করলেন রোগী এবার নিশ্চয়ই মুখের অবারণ উন্মোচন করবে কিন্তু কই, যেমনভাব তেমনি রইল সুভাষিণী।

রায়বাবু বলেন—জোর করে তার মুখের কাপড় সরাতে হয় নইলে ও নিজে কখনও সরায় না।

ডাক্তার বলেন—ডেকে দেখুন একবার।

রায়বাবু কন্যার গায়ে হাত রেখে ডাকলেন—সুভা, সুভা! মা এই দেখ কে এসেছেন।

এতটুকু নড়লো না সুভাষিণী।

জমিদার বাবু কন্যার মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেললেন।

চমকে উঠলেন ডাক্তার। মুখের আবরণ উন্মোচিত হওয়ায় ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল সুভাষিণী। কেমন উদাস করুন চাহনি।

ডাক্তার বিস্ময়াবিষ্টের মত তাকিয়ে রইলেন।

ব্রজবিহারী বাবু কন্যার অবস্থা দর্শনে মুখ ফিরিয়ে নিলেন পিতৃহৃদয় ব্যথায় খান খান হয়ে যেতে লাগল। একমাত্র কন্যা এ অবস্থায় রায়বাবু অস্থির হয়ে পড়েছেন। ডাক্তারকে লক্ষ্য করে বলেন—ডাক্তার বাবু সুভা সেরে উঠবে তো?

ডাক্তার গভীরভাবে যেন কি চিন্তা করছিলেন। রায়বাবুর কথায় সম্বিৎ ফিরে পান, বলেন—উঃ কি বলেন?

বললাম আমার সুভা সুস্থ হবে তো?

হবে রায়বাবু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনাকে কথা দিলাম আপনার কন্যা সুভাকে সুস্থ করবই।

ডাক্তার! অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠেন ব্রজবিহারী রায়।

হ্যাঁ রায়বাবু, আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।

ডাক্তার আপনি যা চাইবেন তাই আপনাকে দেব। আমার কন্যাকে সুস্থ করে তুলুন।

সুভাষিণী তখন আবার মুখের আবরণ টেনে দিয়েছিল।

ডাক্তার নিস্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন, তারপর বলেন—আপনার মেয়ের কাছে সব সময় কে বেশি থাকেন বলতে পারেন?

আমার বৌমা থাকে ওর পাশে।

একবার যদি তাঁকে ডাকতেন আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

বেশ ডাকছি। রায়বাবু কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন—বৌমা, বৌমা, একবার এদিকে এসো তো মা।

অল্পক্ষণেই দরজার ওপাশে চুড়ির মৃদু শব্দ হলো। পর মুহূর্তেই কক্ষে প্রবেশ করেন এক বধূ। পরনে লাল চওড়া পেড়ে শাড়ি। ললাটে সিঁদুরের ফোঁটা। স্থিরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—আমাকে ডাকছেন?

হ্যাঁ মা। ইনি ডাক্তার—সুভাকে দেখতে এসেছেন। তোমাকে ইনি কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবেন। তারপর ডাক্তারকে লক্ষ্য করে বলেন—আমার পুত্রবধূ চন্দ্রাদেবী। আপনি এর কাছে যা জানতে চান জানতে পারেন।

চন্দ্রাদেবী নতদৃষ্টি তুলে তাকাল ডাক্তারের মুখের দিকে। ডাক্তার ব্রজবিহারী রায়কে লক্ষ্য করে বলেন— আপনি দয়া করে একটু বাইরে যেতে পারেন কি? আমি উনাকে....

বেশ বেশ, আমি বাইরে যাচ্ছি। ব্রজবিহারী বাবু বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

ডাক্তার এবার তাকালেন চন্দ্রাদেবীর মুখের দিকে। তারপর গম্ভীর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব, তার ওপর নির্ভর করছে সুভাষিণী দেবীর চিকিৎসা। আশা করি আপনি সঠিক জবাব দেবেন।

নিশ্চয়ই দেব।

সুভাষিণী দেবীর নিকটে বেশি সময় আপনিই থাকেন, তাই না?

হ্যাঁ।

এর অবস্থা ক'দিন হলো এরকম হয়েছে?

একদিন এক ডাকাতের হাতে পড়ে...

ওসব কাহিনী আমি রায়বাবুর মুখে শুনেছি। এবার জানতে চাই, আপনার কি মনে হয় এর সম্বন্ধে?

কিছু ভাবতে থাকে চন্দ্রাদেবী। কারণ সে জানে, যে ভদ্রলোক তাকে সেদিন ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করেছিল সে স্বাভাবিক লোক নয়—দস্যু। একথা জেনেও এতদিন সে সকলের নিকটে গোপন করে এসেছে। কিন্তু আজ ডাক্তারের সামনে আর গোপন রাখতে পারলো না। আসল কথা না বললে হয়তো এর পরিণতি খারাপ হতে পারে। কি জানি কেন অন্যান্য ডাক্তারের চেয়ে এই ডাক্তারের প্রতি বিশ্বাস জন্মালো চন্দ্রাদেবীর। তাছাড়া কোন উপায় তো নেই। সুভাষিণীকে বাঁচাতে হলে কথাটা আর গোপন রাখা চলে না।

ডাক্তার চন্দ্রাদেবীকে নিশ্চুপ দেখে ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেন—কি ভাবছেন? দেখুন, আমার নিকটে কিছু গোপন করতে চাইলে ভুল করবেন।

না না, আমি কিছু গোপন করব না—সব বলছি।

বসুন, একটা চেয়ার দেখিয়ে বলেন ডাক্তার—বসুন, এইখানে বসে বলুন।

ডাক্তার নিজেও বসেন একটা চেয়ারে। ওপাশে তাকিয়ে দেখলেন তিনি সুভাষিণী পূর্বের ন্যায় চোখে মুখে কাপড় ঢাকা দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। এবার প্রশ্ন ভরা দৃষ্টি মেলে তাকালেন চন্দ্রাদেবীর মুখের দিকে, একি! চন্দ্রাদেবীর ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম চক চক করছে তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন বেশ ঘাবড়ে গেছে। হেসে বলেন ডাক্তার—আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই।

বলছি, দেখুন ডাক্তার বাবু, আমার মনে হয় সুভা তাকে ভালবেসে ফেলেছে।

স্বচ্ছ হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলেন ডাক্তার—কাকে?

একটা ঢোক গিলে বলে চন্দ্রাদেবী—যিনি সেদিন সুভাকে ডাকাতের হাত থেকে বাঁচিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন।

মুহূর্তে ডাক্তারের হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে গেল। চমকে উঠলেন ডাক্তার। স্থিরকণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—কাকে ভালবেসে ফেলেছে সুভাষিণী?

ঐ যে বললাম, সেদিন যে ভদ্রলোক ওকে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন তাকে।

এ কথা আপনি কেমন করে জানলেন?

আমাকে সুভা বলেছিল।

চন্দ্রাদেবী, সুভাষিণী আপনাকে যা বলেছে খুলে বলুন দেখি?

বলতে পারি কিন্তু ...

কিন্তু নয়—বলুন, কিছু গোপন করবেন না।

চন্দ্রাদেবী একবার দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে নিল। তারপর গলার স্বর খাটো করে নিয়ে বলতে শুরু করলো—ডাক্তার বাবু সুভা বলেছে যাকে সে ভালবাসে সে স্বাভাবিক লোক নয়। সে নাকি—থেমে যায় চন্দ্রাদেবী।

ডাক্তার ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—বলুন বলুন?

সে নাকি দস্যু বনহুর।

ডাক্তারের দৃষ্টি ধীরে ধীরে নত হয়ে যায়।

চন্দ্রাদেবী বলে কি, এও কি সম্ভব। অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠেন ডাক্তার—না না, এ হতে পারে না—দস্যু বনহুরকে ভালবাসা অসম্ভব।

চন্দ্রাদেবী ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে—বিস্ময়ভরা নয়নে তাকায় তার দিকে তারপর বলে সে—ডাক্তার বাবু আমিও ওকে একথা বারবার বলেছি যা সম্ভব নয়, তা চিন্তা করাও উচিত নয় কিন্তু কিছুতেই সুভা তাকে ভুলতে পারছে না। ওর গোটা অন্তর জুড়ে ঐ একটি ছবি আঁকা রয়েছে—সে ঐ বনহুর। জেগেও সে তাকে স্বপ্নে দেখে। অস্ফুট স্বরে তারই নাম উচ্চারণ করে। ডাক্তার বাবু, আমি এতদিন সকলের কাছে কথাটা গোপন রেখেছিলাম কিন্তু আজ আপনার কাছে না বলে পারলাম না। আপনি যদি দয়া করে কিছু করতে পারেন।

অন্যমনস্কভাবে ডাক্তার বলেন—হুঁ।

চন্দ্রাদেবী তখন বলে চলে—ডাক্তার বাবু সুভার মনের যে অবস্থা, তাতে মনে হয় ও আর বাঁচবে না।

ডাক্তার এবার দৃষ্টি তুলে ধরেন চন্দ্রাদেবীর মুখের দিকে। গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করেন তিনি। তারপর উঠে দাঁড়ান। আচ্ছা, আজকের মত তাহলে চলি।

ততক্ষণে ব্রজবিহারী রায় কক্ষে প্রবেশ করেন সব শুনেছেন তো?

শুনেছি।

আমার কন্যা আরোগ্য লাভ করবে তো?

পরে জানাব। ডাক্তার দরজার দিকে পা বাড়ান।

ব্রজবিহারী রায় পেছন থেকে পুনরায় বলে ওঠেন—শুনুন ডাক্তার বাবু সুভাকে কেমন দেখলেন বললেন না তো।

থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালেন ডাক্তার। তারপর ইতস্তত করে বলেন—পরে জানতে পাবেন।

আজ কিছুই বলবেন না?

না।

আবার কবে আসবেন? ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন ব্রজবিহারী রায়।

ডাক্তার আবার ফিরে এলেন চন্দ্রাদেবী আর ব্রজবিহারী রায়ের পাশে। স্থিরকণ্ঠে বললেন—সময় হলেই আবার আসব।

ব্রজবিহারী রায় পকেট থেকে একশ টাকার একখানা নোট বের করে বাড়িয়ে ধরলেন—এই নিন আপনার ফিস।

ডাক্তার হেসে বলেন—আজ কিছুই লাগবে না। আপনার কন্যাকে সুস্থ করতে পারলে দেবেন। কথাটা শেষ করে বেরিয়ে যান ডাক্তার।

ব্রজবিহারী রায় আশ্চর্য কণ্ঠে বলেন—অদ্ভুত লোক! ফিস পর্যন্ত নিল না।

চন্দ্রাদেবীও ডাক্তারের ব্যবহারে কম অবাক হয়নি। অন্যান্য ডাক্তারের চেয়ে এ ডাক্তার যেন আলাদা। ওর দৃষ্টির কাছে চন্দ্রাদেবী নিজকে সঙ্কোচিত মনে করছিল। কেন যেন একটা কথাও

তার কাছে গোপন করতে পারল না। কথাটা বলা ঠিক হলো কিনা বুঝতে পারে না চন্দ্রাদেবী। শ্বশুরের কথায় কোন জবাব দিতে পারলো না সে।

❑

মনিরা গভীরভাবে চিন্তা করে সন্ন্যাসী তাকে এভাবে এখানে আটকে রেখেছে কেন? এতে কি লাভ তার? এখানে তাকে আটকে রাখার উদ্দেশ্য কি?

মনিরা এখানে আসার পর এতটুকু অসুবিধা হয়নি তার। সে কিছু না চাইতেই হাতের কাছে সব পেয়েছে। এমনকি মনিরা বীণা বাজাতে পারত—একটা বীণাও সাজানো রয়েছে সেই কক্ষে। মনিরার মনে যখন অসহ্য ব্যথা জেগে উঠত তখন সে বীণা নিয়ে বসত।

প্রায়ই নিশীথ রাতে সে বীণায় ঝংকার তুলত। এক করুণ সুরে গোটা পোড়াবাড়ি আচ্ছন্ন হয়ে যেত গহন বনের পাতায় পাতায় ঝড়ে পড়া শিশির বিন্দুর টুপটাপ শব্দের সঙ্গে বীণার সুর মিশে এক অপরূপ মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি হত।

নিঃসঙ্গ জীবন মনিরার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল। নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। যদিও এখানে তাকে কেউ বিরক্ত করতে আসত না। মুরাদের লালসাপূর্ণদৃষ্টি থেকে সে রক্ষা পেয়েছে, নাথুরামের কঠোর নির্যাতন থেকে অব্যাহতি পেয়েছে, তবু একটা ভয় ভীতি আর আশংকা মনিরার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এখনও সে বন্দিনী। মামা মামীমার এবং আত্মীয় স্বজনের নিকটে এখনও সে অজ্ঞাত রয়েছে। কেউ তার সন্ধান জানে না।

মনিরা ভাবে, সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই কোন পুলিশের লোক। নইলে সেদিন পুলিশ আসবে কোথা থেকে। শয়তান মুরাদকে গ্রেপ্তারই বা করে নিয়ে যাবে কেন। কিন্তু সে যদি পুলিশের লোকই হবে তবে তাকে মামা মামীর নিকটে পৌছে না দিয়ে এখানে আটক রাখার মানে কি! নিশ্চয়ই সে কোন অভিপ্রায়ে তাকে এই পোড়াবাড়ির মধ্যে এনে রেখেছে।

মনিরা অসহ্য বেদনায় দগ্ধিভূত হতে থাকে

একদিন নিশীথ রাতে জানালার পাশে বসে করুণ সুরে বীণা বাজাচ্ছিল মনিরা। নিজের সুরে নিজেই তন্ময় হয়ে গিয়েছিল।

কখন যে তার পেছনে সন্ন্যাসী বাবাজী এসে দাঁড়িয়েছেন, খেয়াল নেই মনিরার। আনমনে সে বীণার তারে হাত বুলিয়ে চলেছে হঠাৎ একটা হাতের স্পর্শে মনিরার ঝংকার স্তব্ধ হয়ে যায়। চমকে ফিরে তাকায় মনিরা। তাঁর কাঁধে হাত রেখে সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সন্ন্যাসীর মুখে হাসির রেখা।

মনিরা দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। তারপর কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে সন্ন্যাসীর দিকে। সে দৃষ্টিবাণ যেন সন্ন্যাসী বাবাজীর হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু কি আশ্চর্য। মনিরার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বাণে সন্ন্যাসী এতটুকু বিচলিত হন না বরং তিনি আরও এগিয়ে আসেন মনিরার দিকে। হেসে বলেন বৎস ভয় পেয়েছ। এসো, আমার হাতের ওপর হাত রেখ।

না।

কেন?

মনিরা কোন জবাব দেয় না।

সন্ন্যাসী বলেন তোমার বীণার সুর আমাকে টেনে এনেছে। আমার ধ্যান ভঙ্গ করে দিয়েছে তোমার ঐ বীণার ঝংকার।

মনিরার দু'চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বের হয়। পিছু হটতে থাকে সে। মনে মনে নিজকে ধিক্কার দেয় কেন সে বীণা বাজাতে গিয়েছিল? কেন সে সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ করল? সন্ন্যাসী তখন তার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

মনিরা শিউরে ওঠে।

কিন্তু সন্ন্যাসী তখন এত কাছে এসে পড়েছেন যে, মনিরা আর নড়তে পারে না। চট করে মনিরার দক্ষিণ হাতখানা বলিষ্ঠ হাতের মুঠায় চেপে ধরেন সন্ন্যাসী। তারপর মৃদু হেসে বলেন— এখন?

মনিরা চিৎকার করে ওঠে—ছেড়ে দিন। ছেড়ে দিন আমার হাত।

সন্ন্যাসী হেসে বলেন—না, কিছুতেই না।

মনিরা রাগে অধর দংশন করে বলে—শয়তান। সন্ন্যাসী সেজে আমার সর্বনাশ করতে এসেছ? মনিরা দু'হাতে সন্ন্যাসীর জটাজুট টেনে ধরে।

সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীর মাথা থেকে জটাজুট আর মুখ থেকে দাঁড়ি গোঁফ খসে পড়ে।

মনিরা অস্ফুটধ্বনি করে ওঠে—তুমি!

পরবর্তী বই

দুর্ধর্ষ দস্যু বনহুর